ক্যাপিটেল

কার্ল মার্কস

চলন্তিকা বইঘর
ঢাকা

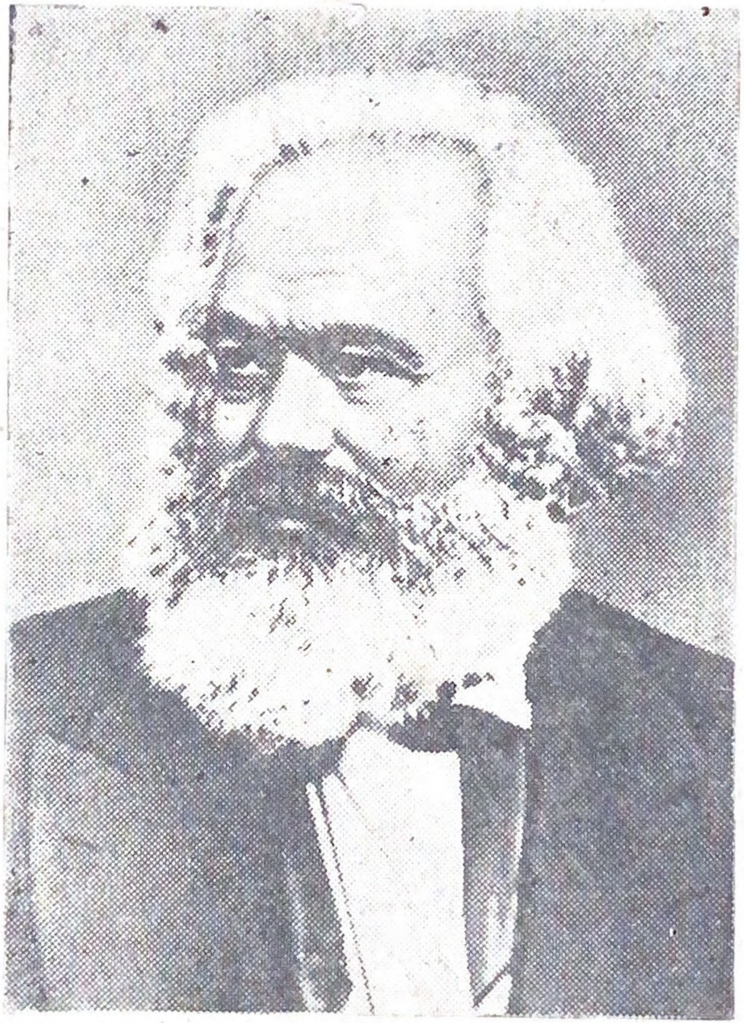

কার্ল মার্কস

[৫ই মে, ১৮১৮—১৪ই মার্চ, ১৮৮৩]

ক্যাপিটেল

কার্ল মার্কস

সার-সংক্ষেপ

রেবতী বর্মণ

চলন্তিকা বইঘর
১৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

প্রকাশক ঃ এম, ইউ, ভূঞা
চলন্তিকা বইঘর
১৪, বাংলাবাজার, ঢাকা—১
ফোন ঃ ২৫৭৩৪৫

আষাঢ়, ১৩৮৬

মুদ্রক ঃ আনন্দ মুদ্রণ
১১, শ্রীশ দাস লেন,
ঢাকা—১

মূল্য ঃ ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

মার্কসের বিচার-রীতি

হাটেবাজারে আমরা দেখিতে পাই, একটি পণ্যের সঙ্গে অপর একটি পণ্যের বিনিময় হইতেছে; অথবা একটি বিশেষ পরিমাণের মুদ্রায় একটি বিশেষ পরিমাণের পণ্য বিক্রয় হইতেছে। ইহাকে বলা হয় পণ্যের মূল্য-রূপ। প্রতিদিনকার এই প্রত্যক্ষগোচর ঘটনাটির পিছনকার রহস্যের উদ্ঘাটন মার্কসের পূর্বে আর সম্ভব হয় নাই। এরিষ্টট্‌ল ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এডাম, স্মিথ এবং রিকার্ডো অনেকখানি অগ্রসর হইয়াও সফল হন নাই। এরিষ্টটলের পর হইতে দুই হাজার বৎসরে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং গবেষণা সম্ভব হইয়াছে; কিন্তু পণ্যের মূল্য-রূপটির প্রতিদিনের একটি ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার মার্কসের পূর্বে হইতে পারে নাই। ইহার কারণ কি? মানুষের সমগ্র দেহটি সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ যত সহজ উহার মূলভিত্তি জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা তত সহজ নয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা অপেক্ষা অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বিচার আরো কঠিন। ইহার জন্য যেমন কোন বিজ্ঞানাগার নাই, তেমনি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের জন্যও কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্র অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া নাই। 'সামাজিক বিষয়ে যে চিন্তা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাকে বলা হয় বিয়োজনরীতি (abstraction)। মানুষের শ্রম-জাত দ্রব্যের পণ্য-রূপ অথবা পণ্যের মূল্য-রূপই হইল বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক জীবকোষ। এই জীবকোষটি হইতেই আমরা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামোর পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছিতে পারি।

মার্কসের বিচারের বিষয় পুঁজিতন্ত্রী সমাজের উৎপাদন-প্রথা এবং

বিনিময়-ব্যবস্থা। মার্কসের সময়ে আদর্শ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ ছিল ইংলণ্ডে। এই কারণেই মার্কস তাঁহার বৈজ্ঞানিক মতবাদ গড়িয়া তুলিবার জন্য ইংলণ্ডকেই সাক্ষ্য ও নিদর্শনরূপে ধরিয়াছেন। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের প্রভাবে বিশেষ একটি সমাজ শ্রেণী-সংঘর্ষের দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা আমরা বিশদভাবে দেখিতে চাই না। দেখিতে হইবে, এই বিশিষ্ট উৎপাদন-প্রথার পশ্চাতে যে মূলীভূত সত্য এবং সূত্র রহিয়াছে তাহা কি করিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে গড়ন এবং ভাঙ্গনের কাজ করিয়া যাইতেছে। যে দেশ আধুনিক শিল্পের দিক হইতে অধিক অগ্রসর তাহার প্রভাব. অনগ্রসর অথবা অল্প-অগ্রসর দেশগুলির উপর পড়িবেই। প্রথমোক্ত দেশে যাহা আজ সম্ভব হইয়াছে অনুন্নত দেশগুলিতেও তাহা অবশ্যই হইতে হইবে।

যে-সমস্ত দেশে সবেমাত্র শিল্পোন্নতি শুরু হইয়াছে সে গুলির উপর পীড়ন হয় দুই দিক হইতে। নবোত্থিত পুঁজিতন্ত্রের অত্যাচারও সেখানে থাকিবেই, তাছাড়া গতায়ু সামন্ততন্ত্রও অবশ্যই মরণ-কামড় দিবে। ইংল্যাণ্ডের মতন দেশে কারখানা-শিল্প উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাই সেখানে ফ্যাক্টরী আইনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে এবং অবশেষে তাহা প্রবর্তিতও হইয়াছে। কিন্তু মার্কসের সময়ে অনুন্নত জার্মানীতে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। পুঁজিতন্ত্রের অপরিণত বিকাশের দরুন অনুন্নত দেশের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার হইতে থাকে; তাছাড়া সামন্তযুগের মুমূর্ষু উৎপাদন-বিধির নির্যাতনও তাহাকে সহ্য করিয়া যাইতে হয়। এই অবস্থাটিকেই মার্কস বলিয়ায়ছন, "We suffer not only from the living, but also from the dead". সকল অনুন্নত দেশই শুধু বর্তমানের চাপেই নির্লিপ্ত হয়না, অতীতের দুঃসহ ভারও তাহাকে সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

আঠার শতকে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ হইতেই ইউরোপের

মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাগরণ সূচিত হয়। উনবিংশ-শতকে আবার আমেরিকারই গৃহযুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির ইঙ্গিত দেয়। মার্কসের সময়ে ইংলণ্ডে সামাজিক ভাঙ্গন খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে। অচিরেই ইহার প্রতিক্রিয়া ইউরোপেও অনুভূত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর কতখানি বিকাশ হইল তাহার উপরই এই প্রতিক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করিবে। কোনও উচ্চ এবং মহৎভাবের অনুপ্রেরণা হইতে নয়, আপন শ্রেণী-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের পক্ষে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে আইনের সাহায্যে তাহা দূর করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। মার্কস তাই তাঁহার মূলগ্রন্থ 'ক্যাপিটেলে' ইংলণ্ডের ফ্যাক্টরী আইন এবং উহার চলাচল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কেননা, একটি জাতি অপর একটি জাতির অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। মার্কস কখনো কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে দেখেন নাই। ব্যক্তিকে তিনি পুঁজিপতি, ভূস্বামী প্রভৃতি রূপেই দেখিয়াছেন। মার্কসের নিকট ব্যক্তি বিশিষ্ট-শ্রেণী-সম্বন্ধ এবং শ্রেণী-স্বার্থেরই প্রতীক। বিশেষ একটি সামজিক সম্বন্ধের উদ্ভব এবং বিকাশের জন্য তিনি কখনো ব্যক্তিকে দায়ী করেন নাই। ব্যক্তি হয়তো বা অন্তরে উচ্চ ভাব পোষণ করিতে পারে, কিন্তু অন্তরালে শ্রেণীস্বার্থের প্রভাবই তাহার উপর কাজ করিতে থাকে। ব্যক্তি প্রধানত তাহার আপন শ্রেণীরই প্রতিনিধি।

অর্থনীতির বিচারে, স্বাধীন চিন্তার শত্রু ব্যক্তিগত বিত্ত এবং শ্রেণী-স্বার্থ। ইংলণ্ডে চার্চ তাহার উনচল্লিশ দফা ধর্মানুশাসনের আটত্রিশ দফার উপর আক্রমণ নীরবে সহ্য করিবে, কিন্তু তাঁহার উনচল্লিশ ভাগের একভাগ মুনাফার উপর হস্তক্ষেপ করিলে তাহা কখনও সহ্য করিবে না। ধর্মযাজকশ্রেণীর নিকট নাস্তিকতা ক্ষমার্হ; কিন্তু ব্যক্তিগত বিত্তের উপর আক্রমণ অমার্জনীয়। ইহা সত্ত্বেও সংরক্ষণপন্থীদের কেহ

কেহ চিন্তার দিক হইতে যে অগ্রসর না হইয়াছেন এমন নয়। শাসক শ্রেণীও ভাবিতে শিখিয়াছে সমাজ একটি জড়ীভূত নিশ্চল পদার্থ নয়। সমাজ পরিবর্তন-সাপেক্ষ এবং প্রতিনিয়ত ইহার পরিবর্তন ঘটিতেছে।

১৮৩০ পর্যন্ত জার্মানীতে বুর্জোয়া-সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং অর্থনীতি অথবা পলিটিকেল ইকনমির ক্ষেত্রেও সেখানে তখন পর্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে নাই। এই বিজ্ঞানটি তখন ধার করিয়া আনিতে হইত ইংলণ্ড এবং ফরাসীর নিকট হইতে। জার্মানীর অধ্যাপক মণ্ডলীকে তখন 'ইস্কুলের ছাত্র' ছাড়া অপর কিছু আখ্যা দেওয়া চলিত না। বিদেশের শিক্ষাই তাঁহারা নিজের দেশের অ-সম অবস্থায় খাটাইতে চাহিত।

১৮৪৮ হইতেই জার্মানীতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার শুরু। এখন অর্থনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু অধ্যাপকদের পক্ষে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার আর সম্ভব হইল না। যদি কেহ বলেন যে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সর্বশেষ উৎপাদন-ব্যবস্থা, ইহার পরিবর্তন নাই, তখন কি ইহাকে বৈজ্ঞানিক-বিচার বলা যাইতে পারে?

শ্রেণী-সংঘর্ষ যতদিন আত্মপ্রকাশ করেনা, ততদিন নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক-বিচার সম্ভব হইলেও হইতে পারে। পুঁজিতন্ত্রের আগাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে বলিয়াই পুঁজিবাদী লেখকেরা মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। তাহাদের মতে পুঁজিতন্ত্রই বিকাশের চরম অবস্থা এবং অপরিবর্তনীয় সমাজ-ব্যবস্থা।

ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাউক। শ্রেণী-সংঘর্ষ যতদিন তীব্র রূপ লয় নাই, ততদিনই 'পলিটিকেল ইকনমির' বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রক্ষা করা হইয়াছে। রিকার্ডো শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাত এবং 'মজুরী ও মুনাফার' বিরোধিতাকে তাহার বিচারের মূল সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই বিরোধ যে প্রাকৃতিক নিয়মের মতই একটি অনিবার্য সমাজবিধি

তাহা স্বীকার করিতে তাহার মোটেই বাধে নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার সমাপ্তিও ঘটিল। রিকার্ডোর জীবনকালেই সিসমণ্ডি রিকার্ডোর আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে আক্রমণ করেন। ১৮২০ হইতে ১৮৩০ এই দশ বৎসর ইংলণ্ডে একই সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিচারের অপপ্রয়োগ দুইই শুরু হইয়াছে। এই বিষয়টির পশ্চাতে রহিয়াছে ইংলণ্ডের তদানীন্তন সামাজিক ব্যবস্থা। একদিকে আধুনিক কারখানা-শিল্প উহার শৈশব অতিক্রম করিয়া ১৮২৫-এ সর্বপ্রথম অর্থসংকটের সম্মুখীন হইয়াছে, অপরদিকে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া নেতৃত্বে শ্রমিকের দল যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ বিরোধিতায় বুর্জোয়া জগতের শ্রেণী-সংঘর্ষ কিছুকালের জন্য ঢাকা পড়িল, 'শস্য-আইন'-এর পর হইতে অভিজাত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ খুব তীব্র হইয়া উঠে; ১৯৩০ সাল হইতেই ইংল্যাণ্ডে প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইল।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক অধিকার হস্তগত করিল। মত এবং পথ দুইদিক হইতেই শ্রেণীযুদ্ধ স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক দিকটিও খসিয়া যায়। ইংলণ্ডে ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট প্রবর্তনের সময়ে উহার বিরুদ্ধে যুক্তি দর্শানোর জন্য মাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালারা সিনিয়রকে নিয়োগ করে। সিনিয়র আবিষ্কৃত "Last hour" সিদ্ধান্ত (১) একটি উদ্ভট বস্তু।

---

(১) ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের প্রবর্তন দ্বারা শ্রমিকের প্রতিদিনের শ্রম-সময় দশ ঘণ্টা করিবার কথা উঠে। সিনিয়র মালিকশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করিয়া যুক্তি দেখাইলেন, শ্রমিককে দিয়া মালিক এগার ঘণ্টায় উৎপাদনের উপকরণাদির এবং শ্রমিকের শ্রম-শক্তির মূল্য উঠাইয়া লয়, বাকী একঘণ্টায় শ্রমিক মালিকের জন্য মুনাফা সৃষ্টি করে। সুতরাং মালিক তাহার নিজের জন্য শ্রমিককে খাটায় মাত্র এক ঘণ্টা, ইহাই সিনিয়রের সুপ্রসিদ্ধ 'Last Hour Theory'

বিজ্ঞানের জায়গা দখল করিয়া বসিল বিবেকহীনতা। অবশ্য সে সময়ে কব্‌ডেন এবং ব্রাইট 'শস্য-আইন বিরোধী লীগের' পক্ষ হইতে যেসকল পুস্তিকা প্রণয়ন এবং প্রচার করেন সেগুলির তেমন-কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকিলেও ঐতিহাসিক একটি দিক যে রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

'১৮৪৮-৪৯'-এর ইউরোপময় বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া সহজেই ইংলণ্ডের উপর পড়িল। শ্রমিকের দাবী উপেক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। শাসকশ্রেণীর একদল অর্থনীতিকে পুঁজিবাদীগণের চাটুকারিতা হইতে উদ্ধার করিয়া ভদ্র পোশাক পরাইতে চেষ্টা করিলেন। এই দলেরই প্রতিনিধি জন ষ্টুয়ার্ট মিল। যে সকল বস্তুর মিশ খাওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সেগুলিকে মিশ খাওয়ানোই তাহার চেষ্টা। "Irreconcilables"-গুলিকে "reconcile" করার ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি প্রবৃত্ত হন। সকল দিক রক্ষার জন্য এই চেষ্টা বুর্জোয়া অর্থনীতির দারিদ্র্য এবং দৌর্বল্যই প্রকাশ করে। ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে যে সময়ে পুজিতন্ত্রের গতিবেগ প্রচণ্ড হইয়া উঠে, জার্মানীতে তখন পুঁজিতন্ত্র মাত্র দানা বাঁধিয়াছে। তবুও জার্মানীর শ্রমিকেরা তথাকার বুর্জোয়া অপেক্ষা অনেকখানি বেশী শ্রেণী-সচেতন হইয়া দাঁড়াইল। এই কারণেই, বুর্জোয়া অর্থনীতির যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই আবার উহার পথে অন্তরায়ও দেখা দিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় অধ্যাপক-মণ্ডলী দুইভাগে ভাগ হইয়া পড়িল। কেহ বা বেশ্‌টিয়েটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কদর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আবার কেহ বা জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পন্থা অবলম্বন করিয়া পরস্পর-বিরোধী বিষয়গুলিকে সমন্বয় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই অদ্ভুত পরিস্থিতির দরুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োগ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সর্বহারা-শ্রেণীর প্রতিনিধিরা যথার্থ পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

মার্কসের মূলগ্রন্থ 'ক্যাপিটেল' রুষভাষায় অনূদিত হয় ১৮৭২ সনে। রুষিয়ার প্রফেসার সাইবার ক্যাপিটাল পড়িয়া লিখেন,—মার্কসতত্ত্ব এডাম স্মিথ এবং রিকার্ডোর মতবাদের বিকাশ এবং পরিণতি ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। ১৮৭২ সনের সেণ্টপিটার্সবর্গের 'ইউরোপীয়ান মেসেঞ্জার' মার্কসের বিচাররীতি সম্পর্কে যে বিশদ আলোচনা করেন, মার্কস স্বয়ং তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পুঁজিতন্ত্রের তথ্যাদির এবং বিজয়াদির বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় দ্বারা মার্কস যেমন উহার মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তেমনি এই সূত্রের বিকাশ এবং পরিণতির ক্রমটিও দেখাইয়াছেন। সামাজিক জীবনের উপর ইহাদের ফলাফল কি দাঁড়াইয়াছে তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। কি করিয়া সমাজের এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিতেছে ইহা দেখনোই মার্কসের চেষ্টা। আজিকার সমাজের অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমন উহার গুণাত্মক অবস্থান্তরও অনিবার্য। এই অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষের প্রত্যয় আছে কিনা, ব্যক্তি এই সম্পর্কে কতখানি সচেতন,—এইরূপ বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না। সামাজিক পরিবর্তন ব্যক্তির ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও চেতনার অপেক্ষা রাখে না; বরং সমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তনদ্বারাই ব্যক্তির অভিপ্রায় এবং চেতনার রূপ নির্ধারিত হয়। সমাজের তুলনায় ব্যক্তির ইচ্ছা এবং চেতনা এত ক্ষুদ্র বলিয়াই উহাদের কখনো সমাজ পরিবর্তনের এবং সামাজিক অবস্থান্তরের মূলসূত্র ধরা যায় না। মার্কসের গবেষণায় তথ্য তথ্যের সহিত তুলিত হইয়াছে। পরস্পরের তুলনায় তথ্যগুলি সমাজ-প্রগতির বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন স্তরের বিষয়। সমাজ-প্রগতির বিভিন্ন স্তরগুলি যে বিভিন্ন সমাজ-সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে মার্কস তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, অর্থনৈতিক সূত্র সকল

দেশের, সকল যুগের ও সকল সময়ের জন্য এক—মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক বিচার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছে। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক যুগের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সূত্র আছে। সমাজের একটি বিশেষ প্রকারের বিকাশের আর যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন সমাজ নূতন নিয়মের অধীন হয়। মার্কস তাঁহার গবেষণায় এই বিচার-রীতির অবলম্বন দ্বারা একটি বিশেষ প্রকারের সমাজ-স্তরের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিনষ্টি সম্পর্কে যেমন আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি ইহার পরবর্তী রূপটির সূত্রও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই কারণেই মার্কসীয় বিচার-রীতি বৈজ্ঞানিক, বাস্তবের সহিত সঙ্গতি-সম্পন্ন।

মার্কসের 'ডায়ালেক্‌টীক' হেগেলের 'ডায়ালেক্‌টীক' হইতে ভিন্ন। উপরোক্ত বিচার ডায়ালেক্‌টীক-সম্মত বিচার। সমাজকে পরিবর্তন-সাপেক্ষ ধরিয়া লইয়া সমাজের বিভিন্ন স্তরের সূত্রগুলি আবিষ্কার এবং ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণ, সম্পূর্ণভাবে ডায়ালেক্‌টীক বিচার-রীতিরই কাজ। মানুষের মনন-ক্রিয়া হইতে উদ্ভুত ধারণাই হেগেলের নিকট 'আইডিয়া' নাম লইয়া একটা বস্তু-অনপেক্ষ সত্ত্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হেগেলের মতে এই 'আইডিয়াই' বস্তুর স্রষ্টা, বাস্তব-বিশ্বটি 'আইডিয়ারই' বাহ্য প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের একটি বস্তু মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হইলেই উহাকে বলা হয় 'আইডিয়া'। (১) ১৮৪২ সালে মার্কস সর্বপ্রথম হেগেলের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। সে সময়ে জার্মানীর চিন্তা-জগতে

---

(১) মানুষ বাহিরের একটি বস্তুকে যখনই প্রত্যক্ষ করে তখন বস্তুটি সম্পর্কে তাহার একটি ধারণা জন্মায়। ইহাকেই মার্কস বলিয়াছেন—object transfered into the head.

হেগেলের খুব প্রভাব। কিন্তু মার্কস যখন ক্যাপিটাল প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন হেগেলকে 'dead dog' আখ্যা দেওয়া একটি ফ্যাসানের মধ্যে পরিগণিত হইল। মার্কস ইহা দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই নিজেকে হেগেলের শিষ্য রূপে ঘোষণা করিলেন।

'ডায়ালেক্‌টীক' হেগেলের নিকট অতীন্দ্রিয় রূপ পাইলেও তিনিই সর্বপ্রথম ইহাকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার দেন। হেগেলের নিকট 'ডায়ালেক্‌টীক' মাথার উপর দাঁড়াইয়া আছে; মার্কস ইহাকে পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরাইয়া আনিলেন। হেগেলের ডায়ালেক্‌টীকের মূল 'আইডিয়া'; মার্কসের নিকট তাহা 'বস্তু'। ডায়ালেক্‌টীকের অতীন্দ্রিয় রূপটি জার্মানীতে আদৃত ছিল; কেননা ইহা চলতি সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধী নয়। কিন্তু ডায়ালেক্‌টীকের বস্তুতান্ত্রিক রূপটি বরদাস্ত হইল না। সকল প্রকার সামাজিক ব্যবস্থাই যে সাময়িক এই সত্যটির উপর মার্কসের ব্যাখ্যায় জোর পড়িয়াছে। মার্কসের ডায়ালেক্‌টীক নির্ভীক এবং বৈপ্লবিক। ইহা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিয়াছে এবং ইহার ধ্বংস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে।

ক্যাপিটেল

পণ্য

এখন যেমন সমাজের ব্যবস্থা, চিরকাল তাই ছিল না। আদিম যুগের মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিতে হইয়াছিল অনেক বেশী। এই লড়াই জীবন-ধারণের লড়াই, জীবিকা-নির্বাহের লড়াই। মানুষের হাতে তখন জীবন-ধারণের উপায় ও উপকরণ ছিল নিতান্ত সামান্য। পশু খাদ্য সংগ্রহ করে তাহার স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা দ্বারা। কিন্তু মানুষকে যদি তাহার স্বাভাবিক হাতিয়ার হাত দুইটির চালনা দ্বারাই খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে এত মনুষ্য-সমাজ ও সভ্যতা কখনো গড়িয়া উঠিত না; মানুষের জীবন পশুস্তরেরই অঙ্গীভূত হইয়া থাকিত। খাদ্য-আহরণ ও উৎপাদনের জন্য এই স্বাভাবিক হাতিয়ারই যথেষ্ট হয় নাই। প্রকৃতি-দত্ত অঙ্গকে সম্পূর্ণ করিতে হইল, হাতে-গড়া উৎপাদনের যন্ত্র দ্বারা। অতি প্রথম-যুগের এই হাতিয়ার পাথরের তৈয়ারী; পাথর নির্মিত হাতিয়ার দ্বারাই তখনকার জীবনোপায় সংগৃহীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা দ্বারা শিকারই মিলিতে পারে, উন্নত-প্রণালীর উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না। শিকারের জন্য বনে-জঙ্গলে একাকী যাওয়া সম্ভব হইত না—প্রকৃতির প্রতিকুল শক্তির সহিত লড়িতে হইলে দলবদ্ধভাবে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকিত না। এইভাবে সামান্য যাহা সংগৃহীত হইত সকলে মিলিয়া ভাগ-বাটোয়ারা করিয়াই খাইত। এই বিশিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর জন্যই খাদ্য তখন ছিল

সকলের সাধারণ সম্পত্তি। কাজে কাজেই সমাজ-কাঠামোও তখন এই বিশিষ্ট ব্যবস্থার অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিল।

উৎপাদন-রীতি ও সমাজের গড়ন এমনি ভাবেই চিরকাল চলিল না; রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। সমাজ-প্রগতির ইতিহাসকে কি দৃষ্টিতে বিচার করা হয়? পেলিওলিথিক যুগ, নিওলিথিক যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ—ইত্যাদিতে বিভাগ করিয়া সমাজ-প্রগতিকে দেখা হয়। প্রথমটির অর্থ হইল প্রস্তর যুগ। বৈজ্ঞানিক-রীতিতে ইতিহাস বিচার করিতে হইলে, উৎপাদনের উপাদানগুলির বিভিন্নতা দ্বারা ইহার স্তর নির্ণয় করাই প্রকৃষ্ট উপায়। মার্কস এই বিচার পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হইয়া সমাজ-ইতিহাসের শেষের স্তরটির অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যে সূত্র অনুসারে সমাজ বিচিত্র রূপান্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। উৎপাদন-প্রণালীর পরিবর্তনের জন্যই যে সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর হয় তাহাই মার্কসের প্রতিপাদন।

ধীরে ধীরে মানুষ লোহা আবিষ্কার করিল, পাথরের জায়গা লইল লোহা। উন্নততর উৎপাদন-প্রণালীর জন্য জীবন-যাত্রাও অনেকখানি স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। কৃষিকার্য এবং হস্তশিল্পের প্রবর্তন হইল। এই স্বচ্ছন্দতার জন্য সংঘবদ্ধ সমবায়ি-জীবনও শিথিল হইয়া পড়িল; সাধারণ-স্বত্বের জায়গায় দেখা দিল ব্যক্তিগত-বিত্ত; বহুর উপর প্রতিষ্ঠিত হইল কতিপয়ের প্রভুত্ব। তখন হইতে আত্ম-প্রকাশ করিল শ্রেণী-বিভাগ, সমাজে বড় ও ছোটর দুইটি শ্রেণী।

সমবায়ি-জীবনে সকলের উৎপাদিত দ্রব্যই সকলের ভিতরে বণ্টন হইত। একজনের প্রস্তুত দ্রব্য অপরের প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিয়া প্রয়োজন মিটানো হইত না। প্রথমটায় অভাবও ছিল কম; নিজের পরিবারের গণ্ডির ভিতরেই মোটামুটি অনেক জিনিস প্রস্তুত

করিবার সুবিধা ছিল। ধীরে ধীরে একজনার উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশ, অপরজনার উৎপাদনের অতিরিক্ত অংশের সহিত বিনিময় হইতে লাগিল। এই বিনিময়-প্রথা ক্রমেই বিকশিত হইয়া সকল উৎপাদনকারীকেই সকল উৎপাদনকারীর উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। এখন দেখা যায় সকলেই উৎপাদন করে বিনিময়ের জন্য। সুতরাং সম্পত্তির উপর সমবায় অধিকার অপসারিত হইয়া যখনই ব্যক্তিগত বিত্তের সৃষ্টি হইল, তখন হইতে শুরু হইয়াছে বিনিময়-প্রথা, লেন-দেন ব্যবস্থা। কেননা, একজন কখনো তাহার সকল রকমের অভাব মিটানোর জন্য নানা প্রকারের উৎপাদন করিতে পারে না। প্রত্যেককেই নির্ভর করিতে হয় প্রত্যেকের উৎপাদনের উপর। অপরের উৎপন্ন-দ্রব্য আমার হাতে আসিতে পারে আমার দ্রব্যের বিনিময়ে। বিনিময়-প্রথার প্রচলনের সময়ে ইহার পরিসর ছিল খুবই সংকীর্ণ; ধীরে ধীরে এখন বিনিময়ের গণ্ডি সুপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

'মার্কস' আলোচনা করিয়াছেন বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-বিধি ও ইহার মূলসূত্র। বিবর্তন-ক্রমের ভিতরে মানুষই সেরা সৃষ্টি। নিজের দেহ সম্পর্কে সবিশেষ জানিলে জীব-জগতের পূর্বতন জাতিগুলি সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মে। পূর্ববর্তী জাতির পরিবর্তনের ফলেই, যে নব-জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সমাজের জীবনেও আমরা দেখিতে পাই পূর্বতন সমাজ-কাঠামোগুলির বিকশিত রূপ বুর্জোয়া-সমাজ। ইহার সম্পর্কে ভাল রকম ধারণা হইলে পূর্বতন সমাজ-কাঠামোগুলির গড়ন আমরা ভাল রকমে জানিতে পারিব। মার্কস বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্কেই পর্যালোচনা করিয়াছেন, প্রসঙ্গত পূর্ব পূর্ব সমাজ কাঠামোগুলিরও পরিচয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

কোন একটি বিষয়ের আলোচনার পদ্ধতি বা রীতি কি? গোটা সমাজ সম্পর্কে যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা 'মোট জনসংখ্যা' হইতে শুরু করিতে পারি। এই মোট জনসংখ্যাকে জাতি, দেশ, শ্রেণী প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া দেখিতে পারি। শুধু তাই নয়, ইহাদের ভিতরে ব্যবসা-সম্বন্ধ, বিনিময়-প্রথা, মুদ্রার প্রচলন প্রভৃতি ছোট ছোট ধারণাগুলিতে আসিয়া আমরা পৌঁছাই। এই ভাবে আমাদের নিকট পৃথক পৃথক সামাজিক বিষয়গুলির ও অনুষ্ঠানগুলির ধারণা হইতে ক্রমেই পৃথক পৃথক ছোট ছোট ধারণাগুলিতে আসিয়া পড়িয়াছি;—পণ্য, মূল্য, বিনিময় প্রভৃতির ধারণায় উপস্থিত হইয়াছি। এখন কথা উঠিতে পারে, এই রীতিতে বিচার কি খুব বৈজ্ঞানিক? বৃহত্তম বিষয়টি, অর্থাৎ সমাজ সম্পর্কেই আমাদের ধারণা অস্পষ্ট। সুতরাং, যাহার সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নাই তাহা হইতে যে বিচার-পদ্ধতি শুরু হয় তাহাতে কখনো ভাল ফলই দেখা দিতে পারে না। কিন্তু একটি সুফল অবশ্য আমরা পাই। এইরূপ বিচারে সমগ্র সমাজ-কাঠামোর ভিতরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ও ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন যদি ফিরিয়া এই ছোট ছোট ধারণাগুলি হইতে আমরা ক্রমেই বড়'র দিকে যাই, অর্থাৎ যেখান হইতে বিচার শুরু হইয়াছিল সেখানেই আবার ফিরিয়া আসি, তবে 'সমগ্র' সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ হইবে।

মার্কস তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ক্রিটিকে' এই বিচার-রীতি সম্পর্কে বলিয়াছেন। ক্যাপিটেল গ্রন্থে এই বিচার-ভঙ্গী তিনি বিশদভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। মার্কসের পূর্ব-শতকে 'সমগ্র'র অঙ্গীভূত পৃথক পৃথক বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কেননা, তখনকার অর্থনীতিকেরা সমগ্র হইতে শুরু করিয়া ছোটর ধারণায় পৌঁছিতেন।

মার্কস এই ছোট ছোট ধারণাগুলি হইতে যাত্রা করিয়া বৃহত্তর বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পরিস্ফুট করিয়াছেন। পণ্য এবং পণ্যের বিশ্লেষণ হইতে শুরু করিয়া বিনিময়, মূল্য, উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রভৃতির সাহায্যেই ধাপের পর ধাপ উঠিয়া সমগ্র বুর্জোয়া সমাজটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'ক্যাপিটেলে'র প্রথম ছত্রটিই হইল, "যে সকল সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা বিশেষ রকমে প্রচলিত, সেখানে তাহাদের ধন দৌলত পণ্যের রাশীকৃত স্তূপ হিসাবেই প্রকটিত হয়। এই রাশীকৃত পণ্য-সম্ভারের একক হইল যে কোন একটি পণ্য।" সুতরাং আমাদের গবেষণা শুরু হইতে হইবে পণ্যের বিশ্লেষণ দ্বারাই। "প্রধানত, পণ্য একটি দ্রব্য, এমন দ্রব্য যাহার গুণ হইতে মানুষের এক ভাবের অভাব মিটিতে পারে। এই অভাব মনের দিক হইতেও হইতে পারে, শরীরের চাহিদা হিসাবেও দেখা দিতে পারে। প্রত্যক্ষত, আমাদের উপভোগের উপায় হিসাবেই হউক আর পরোক্ষভাবে আমাদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি হিসাবেই হউক, কি ভাবে যে দ্রব্য আমাদের চাহিদা মিটায় তাহা দেখার প্রয়োজন নাই।"

"লোহা, কাগজ ইত্যাদি আবশ্যকীয় প্রত্যেকটি দ্রব্যকে, গুণগত ও পরিমাণগত দুইদিক হইতেই দেখা যাইতে পারে। দ্রব্য বহুগুণের সমষ্টি; সুতরাং বহুরকম প্রয়োজনেই ইহা লাগিতে পারে। দ্রব্যের বহুবিধ আবশ্যকতা আবিষ্কার করা ইতিহাসের কার্য। এই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণের সমাজ-স্বীকৃত মান আবিষ্কারও ইতিহাসই করে। মানের বিভিন্নতার আংশিক কারণ দ্রব্যের বিভিন্ন রকমের প্রকৃতি এবং আংশিক কারণ মানুষের মনগড়া রীতি (convention)। লোহাকে মাপিতে হয় ওজন দ্বারা, কাপড়কে মাপিতে হয় দৈর্ঘ্য দ্বারা।"

দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা হইতে জন্ম নেয় দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য। দ্রব্যের প্রাকৃত গুণাগুণ হইতেই দ্রব্যের উপযোগিতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই

উপযোগিতা দ্রব্যের বহির্জাত বিষয় নয়, তাহার ভিতরই রহিয়াছে। লোহা হউক, শস্য হউক, মণি-মুক্তা হউক—সকল পণ্যই বস্তু বলিয়াই এক-একটি ব্যবহার-মূল্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্য। দ্রব্যের প্রয়োজনীয় গুণাগুণকে ভোগের উপযুক্ত করিয়া পাইবার জন্য যে শ্রম তাহার উপর আরোপ করা হয়, সেই শ্রমের সহিত দ্রব্যের এই সকল প্রাকৃত গুণাগুণ নিঃসম্পর্ক। কাঠকে চেয়ার হিসাবে উপভোগের উপযুক্ত করিয়া পাইতে হইলে মিস্ত্রীকে শ্রম করিতে হয়। মিস্ত্রীর শ্রম কাঠে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু চেয়ারে কাঠের যে গুণাগুণ পূর্ব হইতেই রহিয়াছে তাহা নৈসর্গিক; মানুষ ইহাদের সৃষ্টি করে নাই। এই ব্যবহার-মূল্যই বিনিময় মূল্যের ভিত্তি। পণ্যের ব্যবহার-মূল্য না থাকিলে বিনিময়ে কখনও তাহা দাঁড়াইতে পারে না।

বিনিময়-মূল্য কাহাকে বলে? দুইটি পণ্য ধরিয়া লওয়া যাউক, যেমন শস্য ও লোহা। যে অনুপাতে ইহারা একে অন্যের সহিত বিনিময় হইতে পারে তাহা নিম্নোক্ত সমীকরণের রূপে দেখানো সম্ভব।

১ মণ শস্য = ১ পাউণ্ড লোহা।

এই সমীকরণটি আমাদের কিসের নির্দেশ দেয়? সমীকরণের দুই পক্ষ অর্থাৎ শস্য ও লোহার ভিতরে একই পরিমাণের একটি সাধারণ বস্তু নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং, দুইটি দ্রব্যই একটি তৃতীয়ের সমান; এই তৃতীয়টি দুইটির কোনও একটি নয়—লোহাও নয়, শস্যও নয়। পণ্যের বিনিময়-মূল্য এই তৃতীয়টির দ্বারাই ধার্য হয়। ব্যবহার-মূল্য হিসাবে পণ্যগুলি বিভিন্ন গুণসম্পন্ন, কিন্তু বিনিময়-মূল্য হিসাবে ইহারা একই বস্তুর বিভিন্ন পরিমাণ মাত্র।

পণ্যগুলির ব্যবহার-মূল্যকে আমরা এখনকার মত বাদ দিয়া আমাদের বিচারের বহির্ভূত করিয়া রাখি। তবে পণ্যগুলি শ্রম-প্রসূত এই সত্যটিই অবশিষ্ট থাকে। কি বিশেষ প্রকারের শ্রম হইতে এইগুলি

উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বাদ দিলাম ; তাহা হইলে পণ্যকে আর আমরা টেবিল, ঘর, অথবা অন্য কোনও প্রকারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য হিসাবে দেখি না ; দ্রব্য কোনও বিশেষ প্রকারের—যেমন মিস্ত্রী অথবা মুচির শ্রমদ্বারা উৎপাদিত, সেই হিসাবেও দেখি না। এই অপনয়ন-প্রণালীর প্রয়োগ দ্বারা এই সত্যেই আমরা উপনীত হইলাম যে, শ্রম সর্বসাধারণের শ্রম, মানুষের শ্রম। তাহা হইলে দেখা গেল, মূলত সকল জিনিসই মনুষ্য-শ্রম-প্রসূত ; এই সত্যটি আবিষ্কার করিতে গিয়া কি বিশেষ ধরনে শ্রম প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার বিচার আমরা অস্বীকার করিয়াছি। এইভাবে দেখিতে গেলে, অর্থাৎ সকল পণ্যই শ্রমের অবয়ব-সম্পন্ন রূপ এইভাবে বিচার করিলে, ইহাদের আমরা বলি মূল্য। বিনিময়-মূল্যই একমাত্র রূপ, যাহার ভিতর দিয়া মূল্য প্রকাশিত হয়।

এই ব্যবহার-মূল্যের অথবা একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য রহিয়াছে এইজন্য যে মানুষের শ্রমের ইহা একটি অবয়ব। মূল্যের পরিমাপ হইবে কিসে ? দ্রব্যের ভিতরকার মূল্য-উৎপাদনকারী বস্তুর সন্ধান আমরা পাইয়াছি। এই বস্তুটি মানুষের শ্রম। দ্রব্যের ভিতরে যতখানি শ্রম দেওয়া হইয়াছে ততখানিই ইহার মূল্য। শ্রমের পরিমাণ নিরূপিত হয় শ্রমের সময় দ্বারা ; শ্রমের সময় ঠিক হয় সপ্তাহ, ঘণ্টা, মিনিট ইত্যাদি দ্বারা।

এখন কথা উঠিতে পারে, একটি পণ্য প্রস্তুত করিতে যাহার যত বেশী সময় প্রয়োজন হয়, তাহার পণ্যের তত বেশী মূল্য। প্রত্যেকটি পণ্য সামাজিক শ্রমের এক-একটি একক অবয়ব। বিশেষ একটি পণ্য হয়ত বা একাধিক উৎপাদনকারী তৈয়ারী করে ; কিন্তু এই পণ্য প্রস্তুত করিতে সকলেরই সমান সময় লাগে না। তথাপি, যে কোনও পণ্যের উৎপাদনে "সমাজনির্ধারিত" শ্রম-সময় ঠিক আছে। বিভিন্ন

উৎপাদনকারীর বিভিন্ন পরিমাণের শ্রমের সময়ের ভিতরে এই "সমাজ নির্ধারিত শ্রম-সময়" একটি 'মধ্যক'। অধিকসংখ্যক উৎপাদনকারীর যে সময় প্রয়োজন হয় তাহা দ্বারাই এই 'মধ্যকটি' প্রভাবিত হয় এবং ইহাই পণ্যের মূল্য। ব্যক্তিগত উৎপাদনকারীর সময় দ্বারা মূল্য নিরূপিত হয় না। "সমাজনির্ধারিত শ্রম-সময়" যদি হয় বার-ঘণ্টা তাহা হইলে পণ্য প্রস্তুত করিতে কাহারও দশ-ঘণ্টা সময় লাগিলেও তাহার পণ্যের মূল্য হইবে বার-ঘণ্টা। এই "সমাজ-নির্ধারিত শ্রম-সময়", সকল অবস্থায়ই একরকম ও অপরিবর্তনীয় থাকিতে পারে না। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলেও ইহাদের প্রয়োগে "সমাজ-নির্ধারিত শ্রম-সময়" কমিয়া যাইতে পারে—তখন পণ্যের মূল্য পূর্বেকার মত না থাকিয়া হ্রাস হইবে।

এই বিচার ও আলোচনা হইতে যে সূত্রটিতে আসিয়া আমরা পৌঁছিলাম তাহা এইরূপ। কোন একটি বিশিষ্ট দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হইবে সেই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের "সমাজ-নির্ধারিত শ্রম-সময়" দ্বারা, দ্রব্য-উৎপাদনে ব্যক্তিগত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নয়। যতক্ষণ না শ্রম-সময়ের পরিবর্তন হয়, ততক্ষণ পণ্যের মূল্য পূর্বের মতই থাকিবে। কিন্তু শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-সময় হ্রাস পায়। পূর্বের যে পণ্য দশ-ঘণ্টায় তৈয়ারী হইত, তাহা হয়ত বা এখন আট-ঘণ্টায় তৈয়ারী হইবে। এই উৎপাদন শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ণীত হয় নানা কারণ দ্বারা। যেমন, শ্রমিকের গড়-পড়তা দক্ষতা, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও প্রয়োগ, উৎপাদন ব্যবস্থার সংগঠন, যন্ত্রপাতির প্রসার ও ইহাদের কার্যকারিতা। প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশও বিশেষ কারণ। নিদর্শন-স্বরূপ দেখানো যাইতে পারে, অনুকূল ঋতুতে হয়ত বা একই পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয় ৮ মণ শস্য তৈয়ারীর জন্য, অথচ প্রতিকূল ঋতুতে তাহা দ্বারা প্রস্তুত হইবে মাত্র চার মণ। সাধারণভাবে

তাহা হইলে ইহাই দাঁড়ায়—শ্রমের উৎপাদন শক্তি বেশী হইলে, দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শ্রম-সময় প্রয়োজন হয় কম ; সুতরাং, ইহার মূল্যও হয় কম। পক্ষান্তরে, উৎপাদন শক্তি হ্রাস হইলে, শ্রম-সময়ের প্রয়োজন হয় বেশী, সুতরাং দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

একটি জিনিসের ব্যবহার-মূল্য আছে কিন্তু তাহার মূল্য না-ও থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে, বায়ু, অনাবাদী জমি, মাঠ ইত্যাদি। অপরদিকে, একটি জিনিস শ্রম-প্রসূত হইলেও এবং ইহার ব্যবহার-মূল্য থাকিলেও, তাহা পণ্য না-ও হইতে পারে। এইখানে আমরা পণ্যের সংজ্ঞা দিব। দ্রব্য মাত্রই পণ্য নয় ; দ্রব্যকে প্রস্তুত করিয়া বিনিময়ে না পাঠাইয়া যদি নিজেই তাহা ভোগ করি, তবে তাহাকে পণ্য বলা চলে না। দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয়, উৎপাদন-কর্তার ভোগে না লাগিয়া যখন তাহা বিনিময়ের মারফতে অপর ব্যক্তির প্রয়োজনে আসে। দ্রব্যের কেবলই ব্যবহার-মূল্য থাকিলে চলিবে না, তাহার 'সামাজিক ব্যবহার-মূল্যও' থাকা চাই অর্থাৎ অপরের তাহার জন্য চাহিদা থাকা চাই। অবশ্য ব্যবহারে না লাগিলে কোন জিনিসেরই মূল্য থাকে না। যে শ্রম এমন জিনিসে দেওয়া হয় তাহাকে বলা চলে নিষ্ফল শ্রম।

সকল পণ্যেরই একটি সাধারণ মূল্য-রূপ আছে। এইখানেই আমাদের নিকট একটি সম্পাদ্য উপস্থিত হইল। ইহার সমাধানের জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিজ্ঞেরা মোটেই চেষ্টা করেন নাই। এই সাধারণ মূল্যরূপটিই পণ্যের মুদ্রারূপ। এখনকার সমাজে আমরা দেখি, সকল পণ্যই মুদ্রার সহিত সমীকৃত হইতেছে ; অর্থাৎ পণ্যের সহিত পণ্যের বিনিময়ের পরিবর্তে বিনিময় হইতেছে পণ্যে ও মুদ্রায়। প্রথম প্রকারের বিনিময়কে আমরা বলিতে পারি 'দ্রব্য বিনিময়' আর দ্বিতীয়টিকে 'বিক্রয়'।

পণ্যের মুদ্রা-রূপ কি বিনিময়ের প্রথম হইতেই প্রচলিত ছিল ? যদি

তা' না হয়, তবে পণ্যে পণ্যে মূল্য-সম্বন্ধ হইতে কি করিয়া ধীরে ধীরে পণ্য ও মুদ্রার মূল সম্বন্ধ প্রবর্তিত হইল, এই বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে তাহা করিলেই মুদ্রা সম্পর্কিত রহস্যও আমরা উদ্ঘাটন করিতে পারিব।

সর্বাপেক্ষা সরল মূল-সম্বন্ধ প্রকটিত হয়, একটি পণ্যের সহিত অপর একটি পণ্যের বিনিময়ে ও সমীকরণে। ইহাকে বলা হয়, 'প্রাথমিক মূল্য-সম্বন্ধ'। নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা ইহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

২০ গজ বস্ত্র=১ কোট

বৈজিক সংখ্যার সাহায্যে ইহাকে নিম্নোক্তরূপে বলা যাইতে পারে।

ক পণ্য ব=খ পণ্য দ

'ব' এবং 'দ' পণ্যের নাম, “ক'' এবং “খ'' পণ্যের পরিমাণ। এইভাবে মূল্যকে প্রকাশিত করিতে গিয়া আমরা সমীকরণের দুইটি পক্ষ ধরিয়া লইয়াছি। দক্ষিণ পক্ষটিকে বলা হয়, আপেক্ষিকরূপ এবং বাম পক্ষটিকে বলা হয় তুল্যরূপ। মূল্য-প্রকাশ-মূলক সমীকরণে ইহারা বিভিন্ন ভূমিকা সম্পাদন করে। বস্ত্র নিজের মূল্য প্রকাশ করিতেছে কোটের ভিতরে, আর কোট নিষ্ক্রিয় থাকিয়া বস্ত্রের সম্মুখে দর্পণের কাজ করিতেছে। প্রথমটি সক্রিয়, আপনার মূল্য প্রকাশের জন্য উদ্‌ব্যস্ত; দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয়, অপরের মূল্য আপনার ভিতরে প্রকাশ হইতে দেওয়াই তাহার কাজ। কোনও পণ্যের মূল্য ঠিক সেই পণ্যেরই ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে যাওয়া একেবারেই অর্থহীন। কখনও কেহ বলে না, ২০ গজ বস্ত্র=২০ গজ বস্ত্র; একই জাতীয় দুইটি জিনিসের সমানত্ব প্রমাণ নিতান্তই হাস্যকর। সুতরাং বস্ত্রের মূল্য প্রকাশ করিতে অন্য প্রকারের একটি পণ্যের প্রয়োজন হইবে। অপর একটি পণ্যের সহিত তুলনা করিয়া বস্ত্রের মূল্য প্রকাশ করিতে হইবে। যে কোনও পণ্যের মূল্য প্রকাশ করিতে অন্য পণ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই সমীকরণে কোটকে বস্ত্রের তুল্য হিসাবে দেখিয়াছি ; সুতরাং মূল্যের প্রকাশ করিতে গিয়া বস্ত্র হইয়াছে আপেক্ষক। আপেক্ষক বলিলেই তুল্যটির কথা আপনা হইতেই মনে পড়ে। বস্তুত, আমরা কোটকে বস্ত্রের তুল্য করিয়া দুইটির ভিতরে যে শ্রমের পরিমাণ রহিয়াছে তাহাকেই প্রকাশিত করিয়াছি। অবশ্য ইহা সত্য যে, বুনন ও সীবন দুইটি বিভিন্ন রকমের কার্য ; কিন্তু মূলত, দুইটিই মানুষের শ্রম, মানুষেরই দৈহিক অপচয়। রবিনসন ক্রুশো তাহার নিজেরই শ্রমের প্রয়োগ দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। বিভিন্ন উৎপাদনের জন্য তাহার শ্রমের সময় নানাভাবে ভাগ করিয়া লইত। বিভিন্ন প্রকারে শ্রম প্রয়োগ করিলেও, সকল প্রকারের শ্রমই ছিল একজন ব্যক্তিরই শ্রম। ব্যক্তিগত শ্রম এই প্রসঙ্গে বিচার্য নয় ; বিভিন্ন পণ্য যে সমাজের মোট শ্রমেরই বিভিন্ন রূপ তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।

তুল্য সম্পর্কে তিনটি সূত্র এখানে আমরা সন্নিবিষ্ট করিতে পারি।

১। তুল্য স্বয়ং একটি ব্যবহার-মূল্য, তাহার মধ্য দিয়া মূল্য প্রকাশিত হইয়াছে।

২। তুল্য বাস্তব শ্রমের (concrete labour) ফল, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রকাশিত হইয়াছে অমূর্তশ্রম (abstract labour)।

৩। তুল্য যথার্থত ব্যক্তির শ্রম, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রকটিত হইয়াছে, সর্বসাধারণের সামাজিক-শ্রম। তুল্যের ভিতরে দুইটি বিপরীত সত্যের অবস্থিতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ব্যবহার-মূল্য ও মূল্যে বাস্তব ও অমূর্ত শ্রম, ব্যক্তিগত ও সামাজিকশ্রম—এই বিরুদ্ধ সত্যগুলিই প্রকাশিত হইয়াছে তুল্যের ভিতরে।

দুইটি পণ্যের সমীকরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম পক্ষটি প্রকাশিত হইতেছে ব্যবহার-মূল্য হিসাবে।

দ্বিতীয় পক্ষটি দেখা দিয়াছে প্রথমটির বিনিময়-মূল্য রূপে। সকল

পণ্যের ভিতরেই ব্যবহার-মূল্য ও মূল্য দুইটি বিপরীত সত্য রহিয়াছে। পণ্যের, অন্তর্নিহিত এই বিরোধ প্রকাশ পায় এই সমীকরণের মধ্যে। এমনভাবে দুইটি পণ্যকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হইয়াছে যে, যাহার মূল্য প্রকাশ করার প্রয়োজন হইয়াছে সেইটি প্রত্যক্ষভাবে রহিয়া গেল ব্যবহার মূল্য, আর যাহার ভিতর দিয়া মূল্যকে প্রকটিত করা হইল তাহা হইয়া দাঁড়াইল সাক্ষাৎ বিনিময়-মূল্য।

শ্রম-প্রসূত সকল দ্রব্যই সমাজের সকল অবস্থাতেই এক-একটি ব্যবহার-মূল্য; কিন্তু সমাজ-প্রগতির মাত্র একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে এই রকম দ্রব্য পণ্যের রূপ নেয়। দ্রব্য পণ্যে পরিণত হয়, যখনই শ্রমকে আমরা মূল্য হিসাবে দেখি। পণ্যের মূল্যরূপে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য অধিকসংখ্যার পণ্যে পরিণত হইতে থাকে।

প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা প্রাথমিক মূল্যরূপের অপূর্ণতা দেখিতে পাই। এই রূপটি ভবিষ্যৎ বিকাশের অঙ্কুর মাত্র। এই মূল্যরূপে আমরা মাত্র একটি পণ্যের সহিত অপর একটি পণ্যেরই বিনিময় সম্বন্ধ দেখিয়াছি। সুতরাং, ইহা হইতে আমরা প্রথম পণ্যটির অপর সকল পণ্যের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না। কোট এই প্রাথমিক রূপে শুধুমাত্র বস্ত্রেরই তুল্য হইয়াছে, অপর কোনও পণ্যের নয়। ২০ গজ বস্ত্র=১ কোট, এইরূপ এক-একটি সমীকরণে আমরা মাত্র একটি পণ্যের সহিত অপর একটি পণ্যেরই বিনিময়-সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এই প্রাথমিক অবস্থায়, বস্ত্র ভিন্ন আর যতগুলি দ্রব্য পণ্যে পরিণত হইয়াছে তাহাদের সহিত বস্ত্র পৃথক পৃথক সমীকরণের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে।

যথা—২০ গজ বস্ত্র=১ কোট
২০ গজ বস্ত্র=২ জোড়া জুতা
২০ গজ বস্ত্র=১ মণ ধান।
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এমন একটি রূপ আমাদের নিকট এখনও আসে নাই যাহা হইতে আমরা স্পষ্টভাবে সকল পণ্যের সহিত যে কোনও পণ্যের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিব। এই অপূর্ণতা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া অন্য একটি মূল্য রূপের সৃষ্টি হইল, ইহাকে বলা হয় 'বিতত মূল্য-রূপ' (Extended form of value)। এই রূপটি হইল—২০ গজ বস্ত্র=১ কোট, অথবা =১০ পাউণ্ড চা, অথবা=৪০ পাউণ্ড কফি। বস্ত্র-পণ্যটির মূল্য অন্যান্য যাবতীয় পণ্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই এখন বস্ত্রের নিকট দর্পণবিশেষ। কারণ, ইহাদের ভিতর দিয়া বস্ত্র আপন সার-বস্তু অর্থাৎ মূল্যকে দেখিতেছে, আপন আসল চেহারাটি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। সকল পণ্যেরই মূলে যে মানুষের শ্রম রহিয়াছে তাহা এইরূপে খুব বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি বিশেষ পণ্যের মূল্য বহু পণ্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে— ইহা হইতে কি এই নির্দেশই আমরা পাই না যে, এই সকল পণ্যের ভিতরে বিশেষ রকমের একটি সমতা রহিয়াছে, একটি সাধারণ-বস্তু ইহাদের ভিতরে অবস্থিত রহিয়াছে। এই সাধারণ বস্তুটি প্রাথমিক মূল্য রূপে রহিয়াছে কিনা সন্দেহ থাকিলেও বিততরূপে এই সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। পণ্যগুলির মূলে যদি মানুষের শ্রম না থাকে একটি বিশেষ পণ্য এতগুলি পণ্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে কি করিয়া?

প্রথম রূপ হইতে অর্থাৎ ২০ গজ বস্ত্র=১ কোট, এই সমীকরণ হইতে মনে করা যাইতে পারে, এই দুইটির বিনিময় সম্বন্ধ 'আকস্মিকভাবে' ঘটিয়াছে, ইহাদের ভিতরে সাধারণ কোনও বস্তুর অবস্থিতি নাই। কিন্তু দ্বিতীয় রূপটিতে এই সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। আকস্মিক রকমের কোনও সম্বন্ধ এখানে টিকিতে পারে না। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, বস্ত্রের পরিমাণ সকল সময়ই ২০ গজই রহিয়াছে; যে

কোনও পণ্যই তুল্যরূপে ব্যবহৃত হউক না কেন, এই বিশ গজ পরিমাণের পরিবর্তন হয় নাই। ইহাতে কি মনে হয় না যে, আপেক্ষক ও তুল্যগুলির ভিতরে বিশেষ পরিমাণের একটি সাধারণ বস্তু আছে। কিন্তু দ্বিতীয় রূপেরও অপূর্ণতা রহিয়াছে। এই রূপটিতে একটি পণ্য যে কতকগুলি পণ্যের সহিত সমীকৃত ও তুলিত হইতে পারে, তাহার কিছু শেষ পাওয়া যায় না। ১নং পণ্য=২নং পণ্য=৩নং পণ্য ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ইত্যাদিটির কোন শেষ নাই। ইহা যেন প্রাথমিক রূপটিই, শুধু পৃথক পৃথক সমীকরণগুলি একটি যুক্ত সমীকরণে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সমীকরণে আপেক্ষক একটি, তুল্য বহু। যখন একটি সাধারণ তুল্যের সহিত বহু আপেক্ষককে মূল্য প্রকাশ করিতে দেখিব তখনই হইবে মূল্য-রূপের সম্পূর্ণতা অর্থাৎ 'বিতত রূপের' ক্রমটিকে বদলাইয়া যদি আমরা সমীকরণের দক্ষিণ পক্ষে একটি আপেক্ষক ও একটি তুল্যকে স্থাপন করিতে পারি, তবেই আর অস্পষ্টতা থাকিবে না। নিম্নোক্ত লেখ্যটির মধ্য দিয়া আমরা এই রূপটি প্রকাশ করিতে পারি।

ব্যাপক রূপ

১ কোট
১০ পাউণ্ড চা
৪০ পাউণ্ড কফি
২ আউন্স সোনা
=২০ গজ বস্ত্র

এই রূপটির প্রাথমিক রূপের চেহারাই বটে কিন্তু ইহা সকলের অধিক ব্যাপক রূপ। এই রূপটি মূল্য-রূপের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে

প্রকটিত হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম সকল পণ্যগুলির পক্ষে মূল্য হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। যাবতীয় পণ্য যখন একটি বিশিষ্ট পণ্যের ভিতরে মূল্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন আর ইহাদের ভিতরে যে মূল্য-সম্বন্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ সকল পণ্যই যে শ্রম-প্রসূত সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

পূর্ববর্তী লেখ্যটিতে বস্ত্রের জায়গায় যদি সোনা স্থানান্তরিত হয়, তবে লেখ্যটির মৌলিক কোন পরিবর্তন না হইলেও, নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটিল।

২০ গজ বস্ত্র =
১ কোট =

এতখানি পর্যন্ত সব ব্যাপারটি আমাদের নিকট পরিষ্কার, অত্যন্ত সহজবোধ্য। কিন্তু যখনই টেবিলকে পণ্যের রূপ দেওয়া হয় অর্থাৎ বাজারে বিনিময়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়, তখনই শুরু হয় মুশকিল। সুতরাং দেখা গেল, ব্যবহার-মূল্য হিসাবে দ্রব্যের মধ্যে কোনও গোলযোগ নাই; দ্রব্যের পণ্য-রূপেই রহস্যটি দেখা দেয়। মানুষের শ্রম বিভিন্ন প্রকারে প্রযুক্ত হইয়া যাবতীয় দ্রব্য তৈয়ারী করে এবং মূল্য সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়টির পশ্চাতে রহিয়াছে উৎপাদকগণের ভিতরের পরস্পর সম্বন্ধ।

প্রত্যেক উৎপাদকই এমন দ্রব্য প্রস্তুত করে যাহা তাহার কাজে না লাগিয়া অপরের কাজে আসে; তাই তাহাদের পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এইভাবে উৎপাদন করিতে হয় বলিয়াই বর্তমান সমাজে উৎপাদনের পশ্চাতে রহিয়াছে উৎপাদকে-উৎপাদকে সম্বন্ধ। কিন্তু সাধারণত আমাদের প্রতীতি জন্মে যে, সম্বন্ধটি যেন সত্য সত্য পণ্যে-পণ্যে সম্বন্ধ। মানুষই প্রকৃতপক্ষে তাহার কল্পনা হইতে দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছে; অথচ ইহারা স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট প্রতিভাত হয়। যাহা মানুষের সৃষ্টি তাহার নিকটই মানুষ আত্মসমর্পণ

করে, তাহাকেই মানুষ পূজা দেয়। পণ্যের সম্পর্কেও ইহাই খাটে। যাহা মানুষের হাতে-গড়া, তাহাকেই আমরা রহস্যাবৃত মনে করিতেছি, পূজা দিতেছি; মনে করিতেছি, বাজারে ইহারা স্বাধীনভাবে বুঝি নিজেদের সম্বন্ধ পরিচালনা করে। বাজারে যে পণ্যের দাম-দর ঠিক হইতেছে তাহা বুঝি আপনা হইতেই হইতেছে; মানুষে মানুষে সম্বন্ধ হইতে তাহা হইতেছে না। আর হয়ত বা জিনিসের দাম কমিয়াছে, বহু মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; আমরা মনে করিয়া থাকি বাজারে এই সকল ঘটিতেছে পণ্যের আপন খেয়াল হইতে।

এই ব্যাপারটিকে মার্কস আখ্যা দিয়াছেন পণ্য-ফেটিসিজম, অথবা পণ্য-পূজা; অর্থাৎ যাহা আমার সৃষ্ট, আমার সামাজিক সম্বন্ধাদি হইতে যাহার চাল-চলন নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে আমরা স্বাধীন-সত্তা-বিশিষ্ট মনে করিয়া আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারীরূপে দেখিয়া থাকি।

পণ্য-ফেটিসিজমের মূল আমরা দেখিয়াছি। শ্রমের দ্বারাই পণ্য প্রস্তুত হয়। সামাজিক শ্রম-শক্তি এমনভাবে ব্যয়িত হয় যে, যে সকল দ্রব্য বিভিন্ন লোকের শ্রম দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহারা উৎপাদন-কর্তার কাজে না লাগিয়া লাগে অপরের প্রয়োজনে; সুতরাং এই সকল দ্রব্যকে বাজারে আসিতেই হয়। বাজারে আসিলেই পণ্য উৎপাদনকর্তার কথা শুনিয়া চলা প্রয়োজন মনে করে না, দাম-দর এমন সূত্র অনুসারে ঠিক হয় যে উৎপাদন-কর্তার ইচ্ছার সহিত তাহার কিছু মাত্র সঙ্গতি নাই। তখনই আমাদের মনে হয় নিজের শক্তিতে আপন ইচ্ছায় এবং স্বাধীন-ভাবেই বুঝি পণ্য চলে। এই ফেটিসিজম্ অন্যান্য প্রকারের উৎপাদন-প্রণালীর ভিতরে থাকিতে পারে না। রবিনসন্ ক্রুশো আপন শ্রম-শক্তি বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য প্রয়োগ করিত—তাহার নিকট তাহার প্রস্তুত দ্রব্যাদি মোটেই রহস্যাচ্ছন্ন ছিল না; নিজেই প্রস্তুত করিয়া নিজেই তাহা ভোগ করিত। রবিনসন্ ক্রুশোর কথা অবশ্য কাল্পনিক। মধ্যযুগের ব্যবস্থা

সম্পর্কে আমরা কি জানি? দাস প্রভুর জন্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; মানুষের শ্রম দ্বারাই যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; মানুষের শ্রম দ্বারাই যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় সে সম্পর্কে কাহারো কোন সংশয় নাই। একান্নভুক্ত পেটিয়ার্কেল পরিবারে, অথবা হিন্দু সমবায়ী-জীবনে, পরিবারের অথবা সমবায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করান হইত, তাহারা সকলে মিলিয়া সামাজিক শ্রম-প্রসূত দ্রব্যগুলি ভোগ করিত। এইরূপ ব্যবস্থায় মানুষের সহিত তাহার প্রস্তুত দ্রব্যাদির কোনরূপ রহস্যাবৃত সম্বন্ধ নাই। ভবিষ্যতের সমাজেও এই রহস্যটির কোন স্থান থাকিবে না। কেননা, সেরূপ সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার রীতি আমূল পরিবর্তিত হইবে। সকলের সম্মিলিত শ্রম-শক্তি সমাজের ব্যবহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যয়িত হইবে; বাজারে বিনিময়ের সাহায্য ছাড়াই দ্রব্যাদি সকলের ভোগ-সম্ভোগের জন্য বন্টিত হইবে। এখানে দ্রব্য পণ্যেও পরিণত হয় না, বাজারে দাম-দরের এবং বিনিময়েরও কোন স্থান থাকে না; এই কয়টি নিদর্শনেই আমরা দেখিলাম এই সকল উৎপাদন-রীতির ভিতরে বাজার ও বিনিময়ের যেমন কোন স্থান নাই, তেমনি দ্রব্য-সম্পর্কে কোনও রহস্য কিঞ্চিৎ মাত্র উপস্থিত হয় নাই।

"সমাজের জীবন-প্রক্রিয়া উৎপাদনেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। সুচিন্তিত পরিকল্পনা দ্বারা উৎপাদন কার্য না চালাইলে, উৎপাদনের উপর হইতে রহস্যের আবরণটি খসিয়া পড়িবে না।"

বিনিময়, মুদ্রা ও পণ্যস-ঞ্চালন *

বাজারে যে সকল উৎপাদনকারীরা পণ্যাদি লইয়া আসে তাহারা স্ব স্ব পণ্যের মালিক। তাহাদের বলা চলে ব্যক্তিগত বিত্তের অধিকারী। আইনের চক্ষে ইহাদের ভিতরের সম্পর্ক হইল চুক্তির সম্পর্ক। ইহারা পরস্পরের নিকট পণ্যের অধিকারী হিসাবেই পরিচিত। মালিকেরা বিভিন্ন ও পৃথক হইলেও পণ্যগুলি পরস্পরের ভিতরে কোনও প্রভেদ রাখে না, সকল পণ্যই সকল পণ্যের ভিতরে একই সত্তাকে খুঁজিয়া পায়। মালিক তাহার আপন পণ্যকে নিজের কোন কাজে লাগাইতে পারে না বটে, তবে এই পণ্যের দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয় যে কোন পণ্যকে সে হাত করিতে পারে। তাহার নিজের পণ্য তাহার নিকট বিনিময়ের উপায় মাত্র। কোন পণ্যই আপন মালিকের নিকট ব্যবহার মূল্য নয়; অথচ অপরের নিকট ইহা ব্যবহার-মূল্য। এই কারণেই সকল পণ্যকেই হাত বদল করিতে হয়। এই হাত বদলকেই বলা হয় বিনিময়। বিনিময়ই এক পণ্যকে অপর পণ্যের সহিত মূল্য-সম্বন্ধ দাঁড় করায়। সুতরাং পণ্যাদিকে ব্যবহার-মূল্য হিসাবে ভোগ-সম্ভোগের জন্য হাতে পাইবার পূর্বেই তাহাদের থাকা চাই মূল্য। অন্যদিকে, মূল্য সম্বন্ধে যাওয়ার পূর্বেই ইহাদের ব্যবহার-মল্য থাকিতে হইবে।

সকল পণ্য সকল পণ্যের সহিত মূল্য সম্বন্ধে আসিতে পারে না, যদি না ইহারা সকলে একটি বিশেষ পণ্যকে সাধারণ-তুল্য হিসাবে পৃথক করিয়া রাখিয়া ইহার সহিত সমীকৃত হয়। এই পণ্যই মুদ্রা।

বিনিময়ের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রত্যেককে হওয়া চাই তাহার আপন পণ্যের মালিক। কিন্তু আদিম-সমাজে এই অবস্থাটি ছিল না,

---

* Commodity circulation

—তখন ব্যক্তিগত স্বত্বের জায়গায় ছিল সাধারণ-স্বত্ব। ইতিহাসে প্রথম বিনিময় দেখা দিয়াছে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়। “অতি আদিমকালে একটি গোষ্ঠী সমষ্টিগতভাবে অপর গোষ্ঠীর সহিত দ্রব্য আদান-প্রদান করিত। গোষ্ঠীর ভিতরের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিনিময় ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়াছে। কালক্রমে যখন সকল দ্রব্যই বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইতে লাগিল, তখন হইতেই উপভোগের এবং বিনিময়ের দ্রব্যের ভিতরে মস্ত প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্রব্য-বিনিময়, অর্থাৎ বার্টারে দেখা যায়, প্রত্যেকটি পণ্যই তাহার মালিকের নিকট বিনিময়ের উপায় এবং অন্যের নিকট ইহা একটি তুল্য বার্টারে পণ্য বিশেষ ব্যবহার-মূল্য হইতে পৃথক ও স্বাধীন হইয়া সম্পূর্ণভাবে বিনিময়-মূল্য রূপে ব্যবহৃত হয় না। বিনিময়ের বিকাশ ইতে বিশেষ-পণ্য শুধুমাত্র বিনিময়-মূল্য অথবা সাধারণ-তুল্যরূপে পৃথক হইয়া পড়ে। সাধারণত দেখা যায়, যখনই একটি সম্পাদ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখনই তাহার সমাধানেরও উপায় আমরা পাই। কখনো কখনো দেখা যায়, যে সাধারণ তুল্যটি আজ কাজ করিতেছে, কাল হয়ত বা তাহার জায়গায় অন্য একটি দেখা দিবে। ধীরে ধীরে বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ পণ্যই এই সাধারণ তুল্যরূপটি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বিনিময়ের পরিসর যতই বৃদ্ধি পাইল, সোনারূপা প্রভৃতি ধাতব পদার্থই এই সাধারণ তুল্য হইয়া দাঁড়াইল। সোনা এবং রূপা'কে প্রকৃতি কখনো মুদ্রার রূপ দিয়া পাঠায় নাই, সামাজিক বিষয় হইতে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সোনা-রূপাকেই মুদ্রায় পরিণত হইতে হইয়াছে। অবশ্য মুদ্রারূপে কাজ করিবার জন্য সোনা-রূপার এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক গুণাগুণ রহিয়াছে যাহা অপর পণ্যে নাই।

সোনাকে যতই আমরা টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করি না কেন,

ইহার বিভিন্ন টুকরার একই গুণ রহিয়াছে। মুদ্রা-পণ্যটিকে আমরা ইচ্ছামত বিভাগ অথবা সংযোগ করিতে পারি বলিয়া মুদ্রাই উপযুক্ত সাধারণতুল্য হইতে পারে। অন্য যে কোনও পণ্যকে যদি টুকরা টুকরা করি তবে তাহা মূল্যহীন হইয়া পড়িতে পারে। টুকরাগুলিকে যদি একত্র সংযুক্ত করি তাহার পূর্ব উপযোগিতা ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব হয় না। সোনাকে টুকরা টুকরা করিয়াও আবার যদি সেগুলিকে একত্র করি তাহার পূর্ব-মূল্য আমরা অক্ষুণ্ণভাবেই পাই।

সমস্ত পণ্যেরই মূল্য মুদ্রার ভিতরে প্রতিফলিত হয়। মুদ্রা একটি পণ্য—এই আবিষ্কারটি নূতন নয়। বিনিময় ঘটনাটি মুদ্রাকে সকল পণ্যের মূল্য-রূপে পরিণত করে; কিন্তু বিনিময় হইতে তাহার মূল্য সৃষ্টি হয় নাই। শ্রম-প্রসূত বলিয়াই ইহা মূল্য। মুদ্রা বিনিময়ে আসার পূর্ব হইতেই মানুষের শ্রম-প্রসূত; বিনিময়ে আসিয়াও ইহা বহু কাল পণ্য হিসাবেই ছিল, তুল্যের স্থান লইতে পারে নাই। সোনার মুদ্রা রূপ কিভাবে হইল তাহার ইতিহাস আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। মুদ্রার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, সকল পণ্যকেই মূল্য হিসাবে প্রকটিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। এই কারণে মুদ্রা সকল পণ্যেরই মূল্যের পরিমাপক।

সকল পণ্যই মনুষ্যশ্রম-প্রসূত; তাই পণ্যগুলির ভিতরে পরস্পর তুলনা চলিতে পারে; ইহাদের ভিতরকার সাধারণ বস্তুটিরই বাহ্যিক ও সর্বজনীন রূপ হইল মুদ্রা। সোনায় যে কোনও পণ্যকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা চলিতে পারে।

ক পণ্য ঘ=খ মুদ্রা; খ পরিমাণের মুদ্রা হইল পণ্যের বাজার-দর। এক টন লোহা=২ আউন্স সোনা, এই সমীকরণ লোহার মূল্য প্রকাশ করিতেছে। মূল্যের এই প্রকার প্রকাশ দ্বারা সুবিধা হইল যে, যে কোনও দ্রব্যকে বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিবার পূর্বেই তাহার বাজার-দর নিরূপণ করিয়া দেওয়া চলিতে পারে।

প্রথমই আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন ; সোনার মূল্যের তারতম্য হইলেও বাজার-দরের মান (standard of price) হিসাবে তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। মূল্য যেমনই পরিবর্তন হউক না কেন, সোনার বিভিন্ন অংশের ভিতরে একটি সমানুপাত রহিয়াছে। মূল্য হয়ত বা অর্ধেক হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু ১২ আউন্স সোনা সকল সময়েই এক আউন্সের বার গুণ থাকিবে। সুতরাং মূল্যের দিক হইতে সোনা যতই পরিবর্তনশীল হউক না কেন, বাজার-দরের মান হিসাবে তাহা অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয় সোনার মূল্যের পরিবর্তন হইলেও মূল্যের পরিমাপ হিসাবে ইহার কাজের কোন ব্যাঘাত হয় না। কেননা, ইহার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকল পণ্যেরই বাজার-দর পরিবর্তন হইবে।

এক আউন্স সোনাকে বিভাগ করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়া হইল পাউণ্ড, শিলিং ইত্যাদি। এখন আর পণ্যের দর এক আউন্স সোনা না বলিয়া, এক আউন্স সোনায় যত পাউণ্ড, শিলিং হয় তাহাই বলা হইবে অর্থাৎ এক আউন্স সোনাকে বলি তিন পাউণ্ড সতর শিলিং সাড়ে দশ পেন্স। এখন প্রশ্ন উঠিবে, বাজার-দর কি সকল সময়ই মূল্যকে প্রকাশ করিতে পারে ? ধরা যাউক, এক পাউণ্ড গম ও দুই পাউণ্ডের সোনা উৎপাদনে সমান শ্রম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দুই-ই সমান মূল্যের। এখন বাজারে অবস্থার তারতম্য হওয়াতে যদি এক কোয়ার্টার গমের বাজার-দর তাহার প্রকৃত মূল্যের সমান না থাকিয়া ৩ পাউণ্ড অথবা ১ পাউণ্ড হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে এই দুইটি দর একবার মূল্য হইতে অধিক এবং অপর সময়ে মূল্য হইতে কম হইয়া পড়ে। এই বাজার-দর বাড়ুক অথবা কমুক, উৎপাদনের অবস্থার কোন রকম তারতম্য না হওয়া পর্যন্ত এক কোয়ার্টার

গমের মূল্য ঠিক পূর্বের মতই রহিয়া গেল। মূল্য এবং বাজার-দরের এই প্রভেদ বিনিময়-প্রথায় অত্যন্ত স্বাভাবিক। মূল্য এবং বাজার-দরে এই পরিমাণাত্মক প্রভেদই যে সংঘটিত হয় তাহা নয়, ইহাও দেখা যায় যে, যে জিনিসের একেবারেই কোন মূল্য নাই অর্থাৎ ইহার উৎপাদনে মানুষের শ্রম প্রয়োজন হয় না, তেমন জিনিসেরও বাজার-দর আছে। এখানকার এমনই সামাজিক ব্যবস্থা যে, মানুষের মান-সম্মান, বিবেক প্রভৃতিও বাজার-দরে বিক্রয় হয়। ইহাদের ত আর মূল্য নাই।

বিনিময় একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। যাহার নিকট পণ্য ব্যবহার-মূল্য নয়, তাহার হাত হইতে যে ব্যক্তির নিকট ইহা ব্যবহার-মূল্য, পণ্য তাহার হাতে যায়। পরবর্তী লোকের নিকট গেলেই ইহা ব্যবহারে লাগিবে। পণ্যগুলি প্রথমত পণ্য হিসাবেই বিনিময়ে আসে; ধীরে ধীরে ইহাদের একটি পৃথক হইয়া পড়ে ও মুদ্রার রূপ লয়। তখন মুদ্রাই হইয়া পড়ে একমাত্র বিনিময়-মূল্য, আর সকলগুলি ব্যবহার-মূল্য।

বাজারে আমরা কি দেখি? বিশ গজ বস্ত্র ২ পাউণ্ডে বিক্রয় করিবার জন্য একজন মালিক বাজারে উপস্থিত হইল। বস্ত্র বিক্রয় করিয়া সেই মুদ্রায় সে একখানি বাইবেল খরিদ করিল। প্রথম পণ্যটি মুদ্রায় বিক্রয় হইলে পরে সেই মুদ্রাকে পরিবর্তিত করা হইল অপর একটি পণ্যে। প্রথম পণ্যের মালিক বাজারে দুইটি বিভিন্ন প্রকারের কার্য করিল, —প্রথম বিক্রয়, তারপর ক্রয়। ক্রয় এবং বিক্রয় দুইটি পৃথক পৃথক কার্য হইলেও দুয়ের ভিতরে একটি ঐক্য রহিয়াছে; কেননা, বিক্রয়ই করা হইয়াছে ক্রয়ের জন্য। একটি পণ্যের জায়গায় অপর একটি পণ্য আসিল সত্য; কিন্তু মূল্যের দিক হইতে কি সে লাভবান হইতে পরিয়াছে? মোটেই নয়; মূল্য তাহার হাতে পূর্বের মতই রহিয়াছে—

শুধু রূপান্তর হইয়াছে পণ্যের। এই ঘটনাটিকে এখন আমরা নীচের লেখ্যটি দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি।

পণ্য	মুদ্রা	পণ্য
প	ম	প

সমস্ত প্রক্রিয়াটির অবশ্য মোট ফল প—প; পণ্যের পরিবর্তে পণ্যই সংগ্রহ হইয়াছে। ম অর্থাৎ মুদ্রা মাত্র মধ্যস্থ'র কাজ করিয়াছে। এই মুদ্রা যখন শেষ পণ্যটির মালিকের হাতে আসিয়া পড়িবে, সে তখন অন্য ব্যক্তিকে এই মুদ্রা দিয়া তাহার ব্যবহারোপযোগী পণ্য ক্রয় করিবে—এইভাবে মুদ্রা ক্রমেই এক ব্যক্তির হাত হইতে অন্য ব্যক্তির হাতে গিয়া পড়িতেছে। মুদ্রা বাজার ও বিনিময়-প্রক্রিয়ার ভিতরে থাকিয়া সর্বদা মধ্যস্থ'র কাজ করিয়া যাইতেছে, অথচ পণ্যগুলি হাত-বদল করিয়া ক্রমেই বাজার হইতে সরিয়া পড়িতেছে। মুদ্রা একটি প-ম-প প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অপর প-ম-প প্রক্রিয়ায় ঢুকিতেছে। সর্বপ্রথম মুদ্রা যাহার হাতে ছিল, ক্রমেই তাহার নিকট হইতে সরিয়া দূরে যাইতেছে। এই ক্রমাগত সরিয়া যাওয়াকেই বলা হয় মুদ্রার কারেন্সী। সকল পণ্যই বাজারে আসে বাজার হইতে অপক্রান্ত হইবার জন্য, কিন্তু মুদ্রা বিনিময়ে আসে বিনিময়েই থাকিবার জন্য। বিনিময়ে মুদ্রার এই ক্রমিক অবস্থিতির জন্য মনে হয় মুদ্রাই যেন পণ্যের চলাচলের কারণ; কিন্তু কি করিয়া একটি বিশেষ পণ্য মুদ্রা-রূপ গ্রহণ করিল তাহার ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, পণ্যের চলাচল ও বিনিময় হইতেই বিশেষ একটি অবস্থায় মুদ্রার আবির্ভাব হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কোন একটি বিশেষ দিনে বাজারে কত মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। বাজারে যে পরিমাণ পণ্য আসিয়াছে

তাহাদের মোট বাজার-দর যতখানি, ততখানি হইবে মুদ্রার প্রয়োজন। পণ্যের মূল্য যদি অপরিবর্তনীয় থাকে কিন্তু সোনার দর যদি কমে, তবে পণ্যের বাজার-দর বাড়িবে। মোট মুদ্রার পরিমাণও তদনুরূপ বাড়িবে। আবার সোনার মূল্য বাড়িলে পণ্যের বাজার-দর কমিবে; সঙ্গে সঙ্গে মোট মুদ্রার পরিমাণও কমিবে। সুতরাং দেখা গেল, পণ্যের মোট পরিমাণ যদি একই থাকে, তবে সোনার মূল্যের তারতম্য হেতু বাজার-দর বাড়িলে বেশী মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, আর বাজার-দর কমিলে কম মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। ধরা যাউক, চারটি পণ্য একই সময়ে বিক্রয় হইয়াছে; তাহাদের প্রত্যেকের বাজার-দর দুই পাউণ্ড; তাহা হইলে বাজারে প্রয়োজন হইবে মোট আট পাউণ্ড। কিন্তু চারটি পণ্য যদি একটি ক্রম-অনুযায়ী একের পর এক বিক্রয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের মোট বাজার-দর আট পাউণ্ড হওয়া সত্ত্বেও বাজারে মাত্র দুই পাউণ্ডেই কাজ চলিতে পারে। এক কোয়ার্টার গম—২ পাউণ্ড—২০ গজ বস্ত্র—২ পাউণ্ড—১ বাইবেল; ক্রয়-বিক্রয়ের ক্রমটি তখন হইবে ঠিক এই প্রকারের। ২ পাউণ্ড তাহা হইলে চারবার হাত ঘুরিল; এই হাত ঘোরাকে বলিব মুদ্রার গতিবেগ (Velocity); মুদ্রা কতবার হাত ঘুরিয়াছে, তাহা হইতে মুদ্রার গতিবেগ নির্ণীত হইবে। আমরা ধরিলাম, মুদ্রার গতিবেগ ৪। মোট বাজার-দর ও মুদ্রার বেগ জানা থাকিলেই আমরা কোন একটি সময়ে কত মুদ্রার প্রয়োজন তাহা জানিতে পারি। মুদ্রার বেগ যতই বাড়িবে, ততই কম মুদ্রার প্রয়োজন হইবে, আবার গতিবেগ কমিলে মুদ্রার প্রয়োজন হইবে বেশী।

মুদ্রার চলাচল যেমন পণ্যের হস্তান্তর অর্থাৎ বিক্রয় ও ক্রয় দুইটি ঘটনার যোগাযোগের পরিচায়ক, মুদ্রার গতিবেগ তেমনি কত শীঘ্র শীঘ্র পণ্যগুলি তাহাদের রূপ পরিবর্তন করিতেছে তাহারই প্রকাশক। মুদ্রার চলাচল যখনই বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন আর এইরূপ পরিবর্তন এত

শীঘ্র শীঘ্র সম্ভব হয় না। সমাজের দ্রব্য আদান-প্রদানের কাজ তখন নিশ্চল হইয়া পড়ে। এই নিশ্চলতার কারণ আমরা পণ্য-সঞ্চালনের (circulation) ভিতর খুঁজিয়া পাই না, পণ্য-সঞ্চালন শুধু এই ঘটনাটিকে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। যখনই আমরা দেখিব বিক্রয়ের পর ক্রয় আর সম্ভব হইতেছে না, সকলেই শুধু বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করে, কেহই ক্রয় করিতে চাহিতেছে না, ফলে ক্রয়-বিক্রয় দুই-ই নিশ্চল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি সমাজ সঙ্কটের সম্মুখবর্তী। বাজারে শুধু আমরা এই ঘটনাটিই বুঝিতে পারি; কারণ অনুসন্ধান করিতে আমাদের যাইতে হইবে অন্যত্র—সমাজে উৎপাদন-প্রণালীর ভিতরের অ-ব্যবস্থাই এইরূপ সঙ্কটের জন্য দায়ী। এই সঙ্কট সময়ে পণ্য বিক্রয় হয় না বলিয়া মুদ্রা অচল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতিবেগও কমিয়া যায়। সাধারণ লোকের ধারণা, এই সঙ্কটের কারণ বুঝি মুদ্রার অভাব, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ সম্ভব হইবে।

মুদ্রা তৈয়ারী রাষ্ট্রের কার্য। জাতীয় মুদ্রা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিভিন্নতা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পণ্য চলাচলের গণ্ডী দুই রকম—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। কিন্তু সোনা মুদ্রারূপ দেশভেদে পাউণ্ড অথবা ডলার নামে চলে। কিন্তু সোনা সোনরূপে চলে সর্বত্র। আমেরিকাকে যদি ইংলণ্ডের মুদ্রা দিতে হয় পাউণ্ড দিলে চলিবে না, পাউণ্ডকে গালাইয়া এক ডলারে যত সোনা ততখানিই দিতে হইবে। তবেই দেখা যায়, বিদেশে ঋণ শোধের জন্য মুদ্রা পাঠাইতে হইলেই, জাতীয় মুদ্রাকে গালাইয়া সোনা করিতে হইবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রার ভিতরে তাহা হইলে প্রভেদ হইল শুধু চেহারাটাই।

মুদ্রা যখন কারেন্সী হিসাবে নিরন্তর কাজ করিবে, তখনই ধীরে ধীরে তাহার ধাতুর ঘাটতি পড়িতে শুরু করে। নামে হয়ত বা একটি পাউণ্ড

মুদ্রা পাউণ্ড মুদ্রাই রহিল ; কিন্তু বস্তুত তাহার ভিতরে এক পাউণ্ড মুদ্রায় যতখানি সোনা থাকা প্রয়োজন তাহা রহিল না। সুতরাং একই নামের মুদ্রার ভিতরে মূল্যের পার্থক্য ঘটিল। পণ্য চলাচলের ভিতরে এই ব্যাপারটি অবশ্যম্ভাবী, রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত আইনের সাহায্যে স্থির করিয়া দিতে বাধ্য হয় যে, ধাতুর ঘাটতি পড়িলেও অন্তত একটি বিশেষ মাত্রায় সোনা মুদ্রায় থাকা চাই-ই। এই ক্ষয়প্রাপ্তির জন্য এক পাউণ্ডের ওজন কমিল বটে ; কিন্তু ইহা এক পাউণ্ডেরই একটি মুদ্রার মতন কাজ করিয়া যাইতেছে। যে মুদ্রায় ধাতুর ঘাটতি পড়িয়াছে তাহাও আসল মুদ্রারই কাজ করিয়া যাইতেছে। যাহা যথার্থ নয় তাহা দ্বারা যাহা যথার্থ তাহার প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হইল। এই সত্যটি হইতে ধীরে ধীরে শুরু হইল নিদর্শক মুদ্রার (token money) প্রচলন। অর্থাৎ সবখানিই আসল ধাতু না থাকিলেও চলিবে, মুদার একটি বিশেষ অংশ খাদ থাকিলেও হইতে পারে। ধীরে ধীরে একেবারেই যাহার মূল্য নাই তাহার দ্বারা আসল মুদ্রার কাজ চালানোর ব্যবস্থা হইল ; যেমন 'কাগজী-নোট'। বাজারের চাহিদার পরিমাণে যে মুদ্রা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন কাগজী-নোট তাহার অধিক চালানো যায় না। যদি তাহার অধিক কাগজী-নোট পাঠাই তবে কি হইতে পারে? এক আউন্স সোনাকে ধরা যাক যেন চার পাউণ্ড মুদ্রায় পরিণত করা যায়, সুতরাং প্রতি পাউণ্ডে রহিয়াছে এক চতুর্থাংশ আউন্স সোনা। বাজারে যদি থাকে এক পাউণ্ড মুদ্রার প্রয়োজন এবং সে জায়গায় যদি আমরা ১ পাউণ্ডের একটি কাগজী-নোট না পাঠাইয়া দুইটি কাগজী-নোট পাঠাই, তবে একটি কাগজী-নোট ১ পাউণ্ড মুদ্রার ভিতরে যে সোনা আছে তাহার প্রতিনিধিত্ব না করিয়া করিবে $\frac{১}{৮}$ আউন্স সোনার প্রতিনিধিত্ব। যে সকল পণ্যের মূল্য পূর্বে ১ পাউণ্ডের ভিতর দিয়া

প্রকাশিত হইত এখনও ২ পাউণ্ড কাগজী-নোটে প্রকাশিত হইবে। কাগজী-নোট মুদ্রারই নির্দেশক ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। সোনা যখন মুদা রূপে বিনিময়ের কাজ করে, তখনই শুধু কাগজী-নোট তাহার জাগায় বসিতে পারে, অন্য সময়ে নয়।

আজ-কালকার বাজারে দেখা যায়, কোটি কোটি মুদ্রার জিনিস কাট্‌তি হইতেছে। বাজারে এত মুদ্রার যদি নগদ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কিছুতেই বিপুল কাজ কারবার চলিতে পারিত না। বাকীতে পণ্য বিক্রয় হইতে পারে বলিয়াই কাজ-কারবার চলিতে পারে। বিনিময় প্রথা যখন দ্রব্য বিনিময় স্তরে ছিল তখন বাকী কাজ-কারবারের কথাই উঠিত না। মুদ্রার আবির্ভাব হওয়াতেই পণ্যের হিসাব রাখার সুব্যবস্থা হইয়াছে; এইরূপ হইয়াছে বলিয়াই বাকী দিয়াও দুই দিন বাদে মূল্য ফেরত পাওয়া যাইবে, বিক্রেতা ইহা মনে করিতে পারে। 'ক' হয়ত বা এক পাউণ্ডের জিনিস 'খ'কে দিয়াছে, 'খ' নগদ মূল্য না দিয়া প্রতিশ্রুতি দিল দশদিন বাদে সে ঋণ শোধ করিবে। মুদ্রায় মাত্র হিসাবই রাখা হইল, অন্তকার বাজারে মুদ্রার নগদ চলাচল প্রয়োজন হইল না। এইভাবে উদ্ভব হইল ক্রেডিট-মূদ্রার। নীচে একটি বিশদ উদাহরণ দেওয়া গেল।

একটি ফার্ম অন্য একটি ফার্মের নিকট হইতে লক্ষ পাউণ্ডের জিনিস কিনিয়া তাহাকে একটি প্রতিশ্রুতি-পত্র দিল যে, এক মাসের ভিতরে ফার্ম ঋণ শোধ করিবে। ইত্যবসরে দ্বিতীয় ফার্ম তৃতীয় একটি ফার্মের নিকট হইতে লক্ষ মুদ্রার জিনিস কিনিল এবং ইহার পরিবর্তে ফার্মকে প্রথম ফার্ম হইতে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতি-পত্রে আপন স্বাক্ষর সহি দিল। তৃতীয় ফার্ম চতুর্থ একটি ফার্মের একই মূল্যের জিনিস ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় ফার্ম হইতে প্রাপ্ত প্রথম ফার্ম প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি-পত্রটি আপন স্বাক্ষরসহ দিল। শেষোক্ত ফার্ম একমাস বিগত হওয়ার পূর্বেই

প্রথম ফার্মটির নিকট নির্দিষ্ট দিনের প্রতিশ্রুতি-পত্রটিসহ উপস্থিত হইয়া একলক্ষ পাউণ্ড আদায় করিয়া লইল। উক্ত দৃষ্টান্তটি হইতে আমরা দেখিলাম তিন লক্ষ পাউণ্ডের কাজ হইয়াছে; কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দিনে নগদ টাকার প্রয়োজন হইল মাত্র এক লক্ষ পাউণ্ড। এই এক মাসের ভিতরে চতুর্থ ফার্মটি যদি প্রথম ফার্মটির নিকট হইতে একলক্ষ পাউণ্ডের জিনিস কিনিয়া থাকে তাহা হইলে চার লক্ষ পাউণ্ডের কাজ-কারবার হইল, অথচ বাজারে নগদ মুদ্রার একেবারেই প্রয়োজন হইল না। এইভাবে কোটি কোটি মুদ্রার কাজ-কারবার প্রতিদিন চলিতেছে। যদি এই মুদ্রা ক্রেতাদের নগদ দিতে হইত তাহা হইলে উৎপাদন এবং ব্যবসা—বাণিজ্য কখনো বিপুল আকারে হইতে পারিত না। এই প্রতিশ্রুতি-পত্রকে বলা হয়, প্রমিশরী নোট (Promissory note)।

মুদ্রার পুঁজিতে পরিবর্তন

পণ্যের চলাচল হইতেই পুঁজির সূত্রপাত। বাণিজ্যই হইল পুঁজির ঐতিহাসিক ভিত্তি। ১৬ শতকে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও পৃথিবীব্যাপী বাজারের সৃষ্টি হইতেই পুঁজির আধুনিক ইতিহাস শুরু হইয়াছে।

সর্বপ্রথম কুশিদজীবী ও ব্যবসায়ীর মুদ্রাই পুঁজিরূপে প্রকটিত হয়। মুদ্রা পুঁজি না হইয়া শুধু মুদ্রাই থাকিতে পারে। কিংবা মুদ্রা পুঁজিতেও পরিণত হইতে পারে। এই দুইয়ের প্রভেদ প্রথম দৃষ্ট হয়, পণ্য চলাচল

হয় কিভাবে তাহার ভিতরে। এই চলাচলের সরল রূপটি হইল প—ম—প ; পণ্য মুদ্রায় পরিণত হইয়া পুনরায় পণ্যেই ফিরিয়া আসে। এইরূপ চলাচলে বিক্রয় হয় ক্রয়ের জন্য। পণ্য চলাচলের অন্য আরেকটি রূপ রহিয়াছে। ম—প—ম এইরূপে মুদ্রা নিজে পণ্যে পরিণত হয়, পরে পুনরায় পণ্য মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে ক্রয় করাই হয় বিক্রয়ের জন্য। দ্বিতীয় রূপটিতে মুদ্রা সঞ্চালনের ফল হইল মুদ্রার পুঁজিতে পরিণতি।

ম-প এবং প-ম, এই দুইয়ের সংযোগে দেখা যায় মুদ্রাকে যেমন পণ্যে পরিণত করা হয়, তেমনি পণ্যকেও আবার মুদ্রায় পরিবর্তিত করা হয়। সুতরাং ম-প-ম'এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ম-ম ; মুদ্রা দ্বারা শুরু করিয়া আমরা মুদ্রাতেই পৌঁছাই। ১০০ পাউণ্ডে ৩ টন তুলা খরিদ করিয়া যদি তাহা ১১০ পাউণ্ডে বিক্রয় করি, তবে প্রকৃতপক্ষে ১০০ পাউণ্ডকে ১০ পাউণ্ডে পরিবর্তিত করিলাম। সুতরাং মুদ্রায় মুদ্রাই পাওয়া গেল।

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, ১০০ পাউণ্ডকে যদি ১০০ পাউণ্ডে পরিণত করা আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে, ম-প-ম প্রক্রিয়াটি নিরর্থক হইয়া পড়ে। সমান-সংখ্যক কিংবা বেশী অথবা কম পরিমাণে মুদ্রার সহিত বিনিময় হউক না কেন, এই মুদ্রা যে সকল রূপান্তরের ভিতর দিয়া গেল তাহা সম্পূর্ণই নূতন ও মৌলিক।

কৃষক যেভাবে বিনিময় করে এই প্রক্রিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্য রকমের। কৃষক হয়ত বা তাহার উৎপাদিত শস্য বিক্রয় করিয়া কাপড় খরিদ করে ; কিন্তু এই প্রক্রিয়া তাহা নয়। এখন আমাদের দেখিতে হইবে পণ্য-চলাচলের এই দুইটি রূপ অর্থাৎ (প—ম—প ও ম—প—ম) এই দুয়ের মূলগত প্রভেদ কোথায়।

দুইটির ভিতরেই ক্রয় এবং বিক্রয় দুই-ই আছে ; দুইটির ভিতরেই

পণ্য এবং মুদ্রা দুই-ই রহিয়াছে ; দুইটির ভিতরেই বিক্রেতা এবং ক্রেতা দুই-ই বর্তমান। কিন্তু দুইটির ক্রম ও গতি বিভিন্ন। একটি পণ্য হইতে শুরু করিয়া পণ্যে পরিণত হইয়াছে, অপরটি মুদ্রা দিয়া শুরু করিয়া মুদ্রাতেই গিয়া ঠেকিয়াছে। (ম—প—ম) ক্রমটি প্রথমটায় উদ্দেশ্যহীন বলিয়াই ঠেকে ; কেননা মুদ্রা যখন মুদ্রাতেই পরিণত হয় তখন আমরা শেষ পর্যন্ত কোনও ব্যবহার-মূল্য পাইলাম না ; মুদ্রা ত প্রথম হইতেই হাতে ছিল। গোড়ায় এবং শেষে—দুই জায়গায়ই মুদ্রার উপস্থিতি রহিয়াছে বলিয়া ইহাদের ভিতর গুণাত্মক প্রভেদ মোটেই কিছু নাই ; দুইটি দুই রকমের ব্যবহার-মূল্যের ভিতরে যেমন প্রভেদ রহিয়াছে ইহাদের ভিতরে সেই প্রভেদটুকু নাই। তবে দু'য়ের ভিতরে অর্থাৎ প্রথম মুদ্রা ও শেষের মুদ্রার ভিতরে গুণাত্মক প্রভেদ না থাকিলেও পরিমাণাত্মক প্রভেদ রহিয়াছে। গোড়ায় যে পরিমাণ মুদ্রা খাটানো হইয়াছিল, তাহার চাইতে এখন বেশী পরিমাণ মুদ্রা বাজার হইতে তুলিয়া আনা হইল। তাহা হইলে এই প্রক্রিয়াটির প্রকৃত রূপ (ম—প—ম) নয় (ম—প—ম) অর্থ ম+ম=মূল পুঁজি+বর্ধিতাংশ। এই বর্ধিতাংশকেই বলা হয় 'উদ্বৃত্ত মূল্য' (surplus value)। প্রথমকার মূল্যটি অক্ষুন্ন ত রহিলই, তদুপরি তাহার আয়তনও বৃদ্ধি পাইল। এই প্রক্রিয়াটিই মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করে। (প—ম—প) অর্থাৎ ক্রয়ের জন্য যে বিক্রয় তাহার একটা উদ্দেশ্য থাকে যে, যে ব্যবহার-মূল্যটি আমার হাতে আছে, তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া লইতে হইবে আমার ব্যবহারোপোযোগী অপর একটি ব্যবহার-মূল্যে। এই উদ্দেশ্যটি সাধিত হয় বিনিময়-প্রক্রিয়াটি হইতে সরিয়া আসিয়া তবে। কিন্তু যখন আমরা বিক্রয় করিবার জন্য ক্রয় করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে ব্যবহার-মূল্য নয়, বিনিময় মূল্য ; কম মুদ্রা খাটাইয়া তাহাকে বেশী মুদ্রায় পরিণত করিতে হইবে। বিনিময়-মূল্যই

যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তাহাকে বাজার হইতে সরাইয়া না আনিয়া বারংবার খাটাইয়া বড় করাই হয় কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (ম—প—ম) প্রক্রিয়াটি নিরন্তর কার্য করিয়াই চলিয়াছে, তাহার কোথাও বিরতি নাই। (ম—প—ম) একবার সম্পন্ন হয়, পুনরায় শুরু হওয়ার জন্যই। সরল পণ্য চলাচল প্রক্রিয়ার ভিতরে অর্থাৎ (প—ম—প)'র উপযুক্ত ব্যবহার-মূল্য পাওয়াই থাকে উদ্দেশ্য। মূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি সংঘটিত হইতে পারে শুধুমাত্র এই পৌনঃপুনিক (প—ম—প) বিনিময় প্রক্রিয়ার ভিতরেই। পুঁজির চলাচলের তাই কোন শেষ নাই। পুঁজিপতির পকেট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুঁজি বর্ধিতায়তন হয় এবং পুনরায় তাহার পকেটেই ফিরিয়া আসে। পুঁজিপতির নিকট যেমন ব্যবহার-মূল্য ঈপ্সিত নয়, তেমনি একবার মাত্র পুঁজি খাটাইয়া মুনাফা অর্জন করিয়া ক্ষান্ত হওয়াও তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। অবিরাম মুনাফা অর্জনই তাহার একমাত্র কাম্য হইয়া উঠে। ধনের জন্য অপরিসীম লোভ—এই বিষয়ে পুঁজিপতির সহিত কৃপণের মিল রহিয়াছে যথেষ্ট। পুঁজিপতি কৃপণ হইলেও সে যুক্তিবাদী। কৃপণ যাহা পায় তাহাকে আগলাইয়া থাকে, পুঁজিপতি অর্থকে খাটাইয়া তাহাকে বাড়াইতেই সচেষ্ট থাকে।

একই মূল্যের বিভিন্ন আকার রহিয়াছে। কখনো বা পণ্য হিসাবে, কখনো বা মুদ্রা হিসাবে তাহা প্রকাশিত হয়। (ম—প—ম)-এর ভিতরে মুদ্রা এবং পণ্য একই মূল্যের বিভিন্ন অবয়ব মাত্র। অবশ্য মুদ্রার মূল্যের সাধারণ রূপ; পণ্য মাত্র বিশেষ রূপ। মূল্য এক রূপ ত্যাগ করিয়া অন্য রূপ পরিগ্রহ করিতেছে; কিন্তু তাহাতে মূল্যের কিছুমাত্র মূল্যহানি হইতেছে না, শুধু চেহারাই রূপান্তর ঘটিতেছে। এইভাবে বারংবার রূপ পরিবর্তন করিয়া পরিশেষে আপন দেহ হইতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টি করিয়া মূল্য একটি সক্রিয় সত্তা হইয়া উঠিয়াছে।

এই সক্রিয়তার জন্যাই মূল্য অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কখনও বা পণ্যের, কখনও বা মুদ্রার রূপ লইয়া নিজেকে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করিয়া মূল্য সতত ক্রিয়ারত অবস্থায় থাকে বলিয়াই ইহা একটি স্বাধীন রূপ চায়। মূল্য মুদ্রাকে অবলম্বন করিয়া মুদ্রাতেই গিয়া শেষ হয়; এই মুদ্রাই মূল্যের স্বাধীন ও সহজ পরিচয়।

বিক্রয় করিবার জন্য যে ক্রয়, সঠিক করিয়া বলিতে গেলে, বেশী দামে বিক্রয় করিবার জন্য যে ক্রয়, তাহা শুধু ব্যবসায়ী-পুঁজির বেলায়ই খাটে। কারখানা-পুঁজি ও মুদ্রা এই মুদ্রাকে পণ্যে পরিণত করা হয়, এবং পণ্যকে বাজারে বিক্রয় করিয়া পুনরায় তাহাকে মুদ্রায় পরিণত করা হয়।

যাই হউক, পণ্য-চলাচলের ভিতর আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই, (ম—প—ম) পুঁজি বৃদ্ধির একটি ব্যাপক আবরণ-সূত্র।

উদ্বৃত্ত-মূল্য কিভাবে সৃষ্টি হয়।

দেখা গেল যে বিনিময় দ্বারা দুই পক্ষই লাভবান হইতেছে; কেননা, যাহার হাতে তাহার নিজের ব্যবহারোপযোগী কোন জিনিস ছিল না তাহা তাহার হাতে আসিল। ইহা ভিন্ন, আরো এক রকমের লাভ হয়। প্রত্যেকে দুই রকমের জিনিস তৈয়ারী না করিয়া যদি একটি জিনিস তৈয়ারীতেই মনোনিবেশ করে তাহা হইলে মোট উৎপাদন হইবে অনেক বেশী। ধরা যাউক, ক'য়ের চাউল প্রস্তুত করিতেই অধিক সুবিধা; আর খ'য়ের ডাল প্রস্তুত করিতেই সুবিধা বেশী। এই অবস্থায়, যদি ক এবং খ প্রত্যেকে চাউল এবং ডাল দুই-ই প্রস্তুত না করিয়া যাহার যে ব্যবহার-মূল্য প্রস্তুত করিতে সুবিধা তাহাই করে, তাহা হইলে প্রতি সপ্তাহে ১০ মণ চাউল ও ১৫ মণ ডাল উৎপাদন হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকেই যদি উভয় দ্রব্য উৎপাদন করিতে যায়, তাহা হইলে ক হয়ত বা ৪ মণ চাউল ও ৫ মণ ডাল প্রস্তুত করিতে পারিবে,

আর খ ২ মণ চাউল ও ৭ মণ ডাল প্রস্তুত করিতে পারিবে। এই অবস্থায় মোট প্রস্তুত হইবে ৬ মণ চাউল ১২ মণ ডাল। পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় উৎপাদন করিলে, মোট উৎপাদন অধিক হইবে। বিনিময়ের ভিতরে না গিয়া প্রত্যেকেই সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবহার-মূল্য প্রস্তুত করিতে গেলে উৎপাদন প্রত্যেকের কম হইতে বাধ্য। বিনিময় আছে বলিয়াই অধিক ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন হইল। এইখানে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন আমরা ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের ভিতরে গোল না করি। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ব্যবহার-মূল্য দুই পক্ষই বেশী পাইলেও, বিনিময়-মূল্যের দিক হইতে কাহারো কিছু লাভ হইল না। বিনিময়ের মারফৎ যতখানি মূল্য একপক্ষ অপর পক্ষকে দিয়াছে, ততখানিই আবার বিনিময়ে সে পাইয়াছে। (প—ম—প) প্রক্রিয়ার ভিতরে প্রথম আমার হাতে যে পরিমাণ পণ্য ছিল, পরে ঠিক ততখানি মূল্যেরই মুদ্রা আমি পাইলাম। তারপর মুদ্রা দিয়া যখন পণ্য খরিদ করিলাম, তখনও মূল্যের পরিমাণ আমার হাতে সমানই রহিল। মূল্যের রূপ নানাভাবে পরিবর্তিত হইল সত্য, কিন্তু মূল্যের পরিমাণ রহিয়া গেল ঠিক একই প্রকার। পণ্য-চলাচলের ভিতরে বিনিময় হয় সমান মূল্যের; সুতরাং, সহজেই আমরা অনুমান করিতে পারি, পণ্য-চলাচলের ভিতরে কখনো উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হইতে পারে না। কণ্ডিলেক বলিতেন, ইহা সম্পূর্ণই ভুল সিদ্ধান্ত যে, আমরা সমান সমান মূল্যের ভিতরে বিনিময় করিয়া থাকি। বিনিময় হইয়া থাকে, আমার যে জিনিস আমি ব্যবহার করি না, তাহার সহিত অপর একজনার জিনিস যাহা আবার তাহার ব্যবহারে লাগে না। সুতরাং কণ্ডিলেকের মতে, যাহা কম মূল্যবান তাহার বিনিময় হইয়া থাকে যাহা বেশী মূল্যবান তাহার সহিত। ইহা কি সমানে-সমানে বিনিময়? এই ধরনের যুক্তির ভিতরে স্পষ্টই

দেখিতেছি, ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের ভিতরে গোল করা হইয়াছে।

এখন দেখা যাইতেছে, সমান মূল্যের দুইটি পণ্যের ভিতরেই যদি বিনিময় হয় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব হইবে কোথা হইতে? প্রকৃতপক্ষে, বিনিময় হইবে সমানে—সমানে—ধরা যাউক, যেন বিনিময় হইল অসমান মূল্যের ভিতরে।

বিক্রেতা ১০ পাউণ্ড মুনাফায় ১০০ পাউণ্ডের জিনিস ১১০ পাউণ্ডে বিক্রয় করিল। এখন এই বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দিয়া তাহাকে আবার জিনিস ক্রয় করিতে হইবে। তখন তাহার বিক্রেতা হইবে তৃতীয় একজন ব্যক্তি। বিক্রেতা মাত্রকেই যদি লাভ রাখিতে হয় তাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তি ১০ পাউণ্ড লাভ রাখিয়া ১০০ পাউণ্ডের জিনিস ক'য়ের নিকট বিক্রয় করিবে ১১০ পাউণ্ডে। সুতরাং বিক্রেতা হিসাবে ক যেমন ১০ পাউণ্ড লাভ করিয়াছিল, ক্রেতা হিসাবে তেমনি তাহাকে ১০ পাউণ্ড খোয়াইতে হইল।

ঠিক একই ফলাফল হয় যদি আমরা উল্টাভাবে দেখি। ক্রেতা হয়ত কমদরে জিনিস ক্রয় করে; এই জায়গায় বিক্রেতার হয় লোকসান। আবার অন্য সময়ে এই ক্রেতা যখন বিক্রেতা হইয়া জিনিস বিক্রয় করে, তখন সেও লোকসান দিবে। এইভাবে লাভ-লোকসানের অঙ্ক কষিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই সব-কিছুই পূর্বেকার মতই রহিয়া গেল; কাহারো লাভ কিংবা লোকসান কিছুই হইল না। ইহার কারণ, প্রত্যেককেই ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুইয়েরই স্থান নিতে হয়। এমন যদি হইত যে একদল শুধু বিক্রয়ই করে, তাহারা কখনও ক্রয় করে না, তবে শুধু বিনিময় হইতে মুনাফার উৎপত্তি ও সৃষ্টির ব্যাখ্যা চলিতে পারিত।

এই আলোচনা ও বিচার হইতে যে সম্পাদ্যটি আমাদের সম্মুখে

উপস্থিত হইল তাহা এইরূপ। সমান সমান মূল্যের বিনিময় হইতে উদ্বৃত্ত-মূল্য জন্মিতে পারে না, অথচ অসমান মূল্যের বিনিময়েও তাহা সম্ভব নয়। উদ্বৃত্ত-মূল্য একটি যথার্থ এবং সত্য ঘটনা; বিনিময়ে যদি ইহার উৎপত্তি না হয় তবে নিশ্চয়ই অন্যত্র ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

ব্যবসায়ী পুঁজির যুগে অবশ্য কতকগুলি ব্যবসায়ীর হাতে মুনাফা হইতে পুঁজির সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রেণী সমাজের একটি বিশেষ অবস্থায় অল্পদরে জিনিস ক্রয় করিয়া বেশী দরে বিক্রয় করিয়াছে। এইভাবে উভয় দিক হইতে মুনাফা আদায় করিয়া ইহাদের সঞ্চয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হইতে মোটেই হইল না, সামাজিক বৃত্তের মোটেই পরিপুষ্টি হইল না; অপরের হাতে যে মূল্য ছিল তাহা ছলেবলে মাত্র ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে।

পণ্য চলাচলের জগতে অর্থাৎ বাজারে তাহা হইলে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হইতে পারে না; দৃশ্যত যাহা প্রতীয়মান হয় তাহার পশ্চাতে উদ্বৃত্ত-মূল্যরূপ সত্যটির সন্ধান লইতে হইবে।

পণ্য চলাচলের বাহিরে হয় উৎপাদন। এখানেও আমাদের সম্মুখে একটি সমস্যা আসিয়া জুটিয়াছে। চামড়া হইতে বুট তৈয়ারী করিতে গেলে মুচির দাম তাহাতে যুক্ত হইল; তদনুরূপ চামড়ারও মূল্যবৃদ্ধি হইল। সুতরাং চামড়া হইতে বুটের মূল্য বেশী; কিন্তু চামড়ার মূল্য রহিল ঠিক পূর্বেরই মতন। বুট তৈয়ারী হইতে মুচির উদ্বৃত্ত-মূল্য কিছুমাত্র সৃষ্টি হইল না; যতখানি শ্রম সে চামড়ায় আরোপ করিয়াছে, ততখানি মূল্য মাত্র চামড়ার মূল্যের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

মুচিকে যদি উদ্বৃত্ত-মূল্য পাইতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের বাহিরে বিনিময়ের জগতে একটি বিশেষ রকমের পণ্যের মালিকের সহিত বিনিময়-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া কোনও ক্রমেই সে উদ্বৃত্ত-মূল্য

সৃষ্টি ও সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং, এই সূত্রটিতে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম—শুধু বিনিময়ের ভিতরে যেমন উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হইতে পারে না, তেমনি শুধু উৎপাদনেও ইহার উদ্ভব সম্ভব নয়। এই সমস্যাটি উদ্ঘাটন করিতে হইবে।

মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হইতে গেলেই তাহাকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টি করিতে হইবে; কিন্তু মুদ্রা হিসাবে মুদ্রার ভিতরে এই পরিবর্তন সম্ভব নয়; কেননা, মুদ্রা পণ্য খরিদ করিতে গিয়া যে মূল্য আনয়ন করে তাহা এই মুদ্রার ভিতরেই রহিয়াছে। (ম—প)'র ভিতরে যেমন মূল্যের বৃদ্ধি সম্ভব হইল না, (প—ম)'র ভিতরেও তাহা সম্ভব নয়; কেননা, এ সকলগুলিতে মূল্য মাত্র রূপান্তরিত হইল। সুতরাং পরিবর্তন ঘটিতে হইবে যে পণ্যটি প্রথম বিনিময়ের ভিতরে খরিদ করা হইয়াছে তাহাতে। পণ্যটির বিনিময়-মূল্যের দিক হইতে কোন পরিবর্তন হয় না; কেননা, বিনিময় হইয়াছে সমান সমান মূল্যের ভিতরে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, পরিবর্তন ঘটিবে পণ্যের ব্যবহার-মূল্যে অর্থাৎ ইহাকে ব্যবহার করার ভিতরে। মূল্য-সৃষ্টি হয় শ্রম-দ্বারা; সুতরাং পুঁজিপতিকে এমন একটি পণ্যের সাক্ষাৎ লাভ করা চাই, যাহার ব্যবহার ও প্রয়োগ অর্থই হইল উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন। এই বিশেষ পণ্যটিই হইল শ্রম-শক্তি, শ্রম করিবার ক্ষমতা।

শ্রমিক তাহার মানসিক ও কায়িক ক্ষমতা ব্যবহার-মূল্য প্রস্তুত করিতে প্রয়োগ করিয়া থাকে, এই ক্ষমতাকেই বলিতে হইবে শ্রম-শক্তি। বাজারে শ্রম-শক্তিকে পণ্য হিসাবে পাইবার পূর্বে প্রথমত কতকগুলি সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হওয়া চাই। শ্রম-শক্তি পণ্য হিসাবে বাজারে আসিতে পারে তখনই যখন ইহার মালিক অর্থাৎ শ্রমিক শ্রম-শক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কেহ যদি কোন জিনিস বিক্রয় করিতে চায় তবে সেই জিনিসের উপর চাই তাহার স্বত্বাধিকার।

শ্রম-শক্তির পূর্ণ মালিক হইতে হইলে তাহার আপন দেহের উপর শ্রমিকের পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। শ্রম-শক্তির মালিক এবং মুদ্রার মালিক—আইনের সম্মুখে দুয়েরই সমান অধিকার; প্রভেদ এইটুকু যে একজন বিক্রেতা এবং অন্যজন ক্রেতা। শ্রম-শক্তির মালিক তাহার পণ্য বিক্রয় করিবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য—যদি তাহা না করিয়া সারা-জীবনের জন্য সে শ্রম-শক্তি বিক্রয় করে তবে আজীবন তাহাকে কেনা হইয়াই থাকিতে হয়। ফলে, স্বাধীন শ্রমিক না থাকিয়া তাহাকে সারাজীবনের মত দাসত্বের বন্ধনকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। পণ্যের মালিক না হইয়া তখন গোটা মানুষটিকেই পণ্য হিসাবে বিক্রীত হইতে হইবে। শ্রমিক সকল সময়ই তাহার ব্যক্তিগত শ্রম-শক্তির উপর দৃষ্টি রাখিবে, ইহা তাহার আপন জিনিস। শ্রম-শক্তির উপর তাহার স্বত্বাধিকার রক্ষিত হইতে পারে, যদি ক্রেতাকে সে তাহার পণ্য সাময়িকভাবে দেয়।

শ্রমিক যদি তাহার আপন শ্রম-শক্তির প্রয়োগ করিয়া পণ্যোৎপাদন করে ও তাহা বাজারে বিক্রয় করে তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে আপন শ্রম-শক্তি বিক্রয় করিবার প্রয়োজন বোধ করিবে না। সুতরাং এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে হইবে, যেন শ্রমিকের পণ্য উৎপাদনের কোন সুযোগই না থাকে। শ্রম-শক্তি বিক্রয় না করিয়া যদি অপর কোন পণ্য সে বিক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে প্রয়োজন ইহার উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের উপর অধিকার। ইহা ভিন্ন এই মুহূর্তেই তাহার চাই জীবনধারণোপযোগী উপযুক্ত আহারাচ্ছাদনের যোগাড়।

মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করার জন্য পুঁজিপতির পক্ষে বাজারে স্বাধীন শ্রমিকের সাক্ষাৎ পাওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকের মুক্তি হওয়া চাই দুই রকমে। প্রথমত, নিজের শ্রম-শক্তিকে পণ্যরূপে বিক্রয় করিতে কোন

অন্তরায় তাহার থাকিবে না। দাসত্ব হইতে তাহার মুক্তি চাই। দ্বিতীয়ত, শ্রম-শক্তি প্রয়োগের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাদের সকল রকমের স্বত্ব হইতে তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে। শ্রমিকের শ্রম-শক্তি বাজারে পণ্য হিসাবে আসিতে হইলে দাসত্ব এবং পণ্যোৎপাদনের উপকরণ, দুই হইতেই চাই তাহার সম্পূর্ণ মুক্তি।

দাসত্ব-মুক্ত এই স্বাধীন শ্রমিকের জাত কি করিয়া সৃষ্ট হইল তাহার কারণ মুদ্রার মালিক কখনো খুঁজিয়া দেখিতে যাইবে না। আমরাও এইখানে কারণটির অনুসন্ধানে গেলাম না। প্রসঙ্গত একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল, মালিক ও শ্রমিকের ভিতরে প্রভেদ কখনো নৈসর্গিক নয়। কতকগুলি লোক হইবে পুঁজির মালিক, আর কতকগুলি লোক হইবে শ্রম-শক্তিরূপ পণ্যের অধিকারী—ইহার কোনও প্রাকৃতিক ভিত্তি নাই এই সম্বন্ধের মূল কারণ সামাজিক। ঐতিহাসিক পরিণতি ও বিকাশ হইতেই এই অবস্থাটির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা পূর্বতন বহু অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্ববর্তী সামাজিক উৎপাদনের রীতির অবসান হইতে ইহার উদ্ভব।

দ্রব্য যাহাতে পণ্যে পরিণত হইতে পারে, তাহার জন্য চাই বিশেষ একটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। উৎপাদন-কর্তার নিজের জীবনধারণের উপকরণের জন্যই যদি উৎপাদন হয়, তাহা হইলে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে আনীত হইতে পারে না; সমাজ-প্রগতির একটি বিশেষ স্তরে এই অবস্থাটির অবসান হইয়া বিনিময়-প্রথার প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে, বাজারে পণ্য ও মুদ্রার প্রচলন হইতেই পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্টি হয় না। পুঁজিতন্ত্র তখনই আসিতে পারে, যখন নাকি যন্ত্রপাতি ও সকল রকমের গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণের মালিক পুঁজিপতি বাজারে শ্রম-শক্তিরূপ পণ্যের বিক্রয়কারী শ্রমিকের সম্মুখীন হইবে।

সমাজ-উৎপাদনে পুঁজি একটি নূতন অধ্যায় সুচিত করিয়াছে।

এখন আমরা শ্রম-শক্তি পণ্যটির বিশ্লেষণ করিব। শ্রম-শক্তি যখন পণ্য, তখন অন্যান্য পণ্যেরই মতন তাহারও মূল্য রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠিবে, ইহার মূল্য নির্ধারিত হইবে কি প্রকারে? অন্যান্য পণ্যের যেমন মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রমের দ্বারা, তেমনি শ্রম-শক্তিরও মূল্য নির্ধারিত হইবে ইহার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের জন্য কতখানি শ্রম-সময় ব্যয়িত হইবে তাহা দ্বারা। শ্রম-শক্তির অস্তিত্ব শ্রমের সামর্থ্য হিসাবেই। শ্রমের সামর্থ্য যেন মানুষ না হারাইতে পারে তার জন্য শ্রমিককে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাহার জীবন ধারণ এবং ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যক হয় একটি বিশেষ পরিমাণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী উপকরণ। বস্তুত, এই উপকরণের মূল্যই হইল শ্রম-শক্তির মূল্য। শ্রমিকের সামর্থ্য যতক্ষণ প্রয়োগ না হয়, ততক্ষণ নিষ্ক্রিয়ই থাকিয়া যায়। ইহা যথার্থ হয় প্রয়োগ দ্বারা। শ্রম-শক্তির প্রয়োগ অর্থ শারীরিক খাটুনি, দৈহিক ক্ষয়। শ্রমিক আগামীকাল যখন পুনরায় কাজে প্রবৃত্ত হইবে তখন যেন পূর্বদিনের সুস্থতা ও স্বাভাবিক সামর্থ্য লইয়াই কাজ করিতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে। শ্রম করিলেও শ্রমিক যেন স্বাভাবিক মানুষ থাকিয়াই প্রতিদিন বাঁচিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজন প্রতিদিনের ক্ষয়কে পূরণ করিয়া লইবার মত উপযুক্ত উপভোগের উপকরণ। এই উপকরণের মাত্রা এক-এক দেশে এক-এক রকম। ইহা কতকটা নির্ভর করে জল-বায়ুর উপর; শীতপ্রধান দেশে এমন কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন আছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক, সামাজিক কারণে এই মাত্রার তারতম্য হয় অনেকখানি। ইংলণ্ডের লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা ভারতীয়দের অপেক্ষা

বেশী ; সুতরাং শ্রম-শক্তির মূল্যও সেখানে অধিক। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডে ও পাশ্চাত্যের অপরাপর দেশে শ্রমিকসংঘগুলি প্রবল হওয়ায় মালিক শ্রমিকের মজুরী ইচ্ছামত কমাইতে পারে না। দেশভেদে স্বাচ্ছন্দ্যের বিভিন্নতা সত্বেও কোন একটি বিশেষ দেশে এই মাত্রার গড়পড়তা পরিমাণ আমরা বুঝিতে পারি।

পুঁজির লক্ষ্য হইবে, বাজারে শ্রমিকের জোগান যেন স্থায়ী হয় তাহা দেখা। যদি কোনও সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম-শক্তির অভাব ঘটে তাহা হইলে পুঁজির প্রসার সম্ভব হইবে না। তাই শ্রমিকের সন্তান-সন্ততিরা যেন তাহার অভাবে অথবা মৃত্যুর পরে তাহার জায়গা লইতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে শ্রম-শক্তি বাজার হইতে সরিয়া পড়িতেছে তাহার জায়গা পূর্ণ করিবে নূতন শ্রম-শক্তি। সুতরাং এই গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণ যে শুধুই এখনকার শ্রমিককে ভরণপোষণ জোগাইবে তাহা নয়, ভবিষ্যতের শ্রমিক অর্থাৎ বর্তমান শ্রমিকের সন্তানসন্ততিদেরও খোরাকের জন্য তাহা যথেষ্ট হওয়া চাই। আমরা দেখিলাম শ্রম-শক্তির মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ভরণ-পোষণোপযোগী উপকরণ ছাড়া অপর কিছু নয়। এই উপকরণের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শ্রম-শক্তির মূল্যেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে।

এই বিশিষ্ট পণ্যটির একটি বিশেষত্ব হইল এই যে শ্রমিকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিপতি ইহার ব্যবহার-মূল্য হাতে পায় নাই। শ্রম-শক্তির মূল্য অন্যান্য পণ্যের মতই পূর্ব হইতেই অর্থাৎ বিনিময়ে যাইবার পূর্বেই নির্দিষ্ট থাকে ; কিন্তু ইহার ব্যবহার-মূল্য স্থির হয় যখন পুঁজিপতি পরবর্তী সময়ে কারখানায় ইহাকে প্রয়োগ করে। শ্রম-শক্তির বিক্রয় এবং ক্রেতা কর্তৃক ইহার প্রয়োগ,—এই সময়টির ভিতরে একটি ব্যবধান রহিয়াছে। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রম-শক্তি বিক্রয় করিল বটে, কিন্তু তখনও

সে তাহার মূল্য পায় নাই—শ্রমিককে খাটাইয়া অর্থাৎ তাহার শ্রম-শক্তিকে কার্যকরী করিয়া তবে পুঁজিপতি মূল্য দিয়া থাকে। শ্রমিক মূল্য না লইয়াই গতর খাটাইতে রাজী হইল। শ্রম-শক্তির ব্যবহার-মূল্য পুঁজিপতি অগ্রিম পাইল। ইহা যে অত্যন্ত সত্য, তাহা একটি প্রমাণ দেখাইলেই পরিষ্কার হইবে—পুঁজিপতি যদি কখনও দেউলিয়া হয়, কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়, শ্রমিকেরা মজুরি হইতে অবশ্য বঞ্চিত হইয়া পড়ে। বিনিময়ের সময় শ্রম-শক্তির দামই মাত্র ঠিক হয়; কিন্তু শ্রমিককে তাহা বাড়ী ভাড়া দিবার মতন নির্দিষ্ট দিন পর পর আদায় করিয়া লইতে হয়। অবশ্য আমাদের আলোচনায় আমরা ধরিয়া লইব যে মজুর বিনিময়ের সময়ই তাহার মজুরি পায়।

এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছি, পণ্যের ক্রেতা যে দাম শ্রমিককে দেয় তাহা কিভাবে নিরূপিত হয়। যে ব্যবহার-মূল্য ক্রেতা পাইয়া থাকে, তাহা শ্রম-শক্তির প্রয়োগ অথবা ব্যবহার হইতেই সঞ্জাত হয়। শ্রম-শক্তিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে মুদ্রার মালিক কাঁচামাল প্রভৃতি যাহা যাহা প্রয়োজন বাজারে পূর্ণ মূল্য দিয়া সে সকল ক্রয় করিয়া থাকে। শ্রম-শক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ অর্থই হইল নূতন পণ্য উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি।

বাজারের ব্যাপার আমরা দেখিয়াছি। সেখানে সকল কিছুই প্রকাশ্যভাবে সকলের দৃষ্টির সম্মুখেই ঘটিয়া থাকে। এখন এই প্রকাশ্য স্থান হইতে বিদায় লইয়া যদি আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে যে উৎপাদনের স্থান রহিয়াছে সেখানে যাইতে চেষ্টা করি, তবে দেখিব ইহার প্রবেশ-দ্বারে লেখা রহিয়াছে, "প্রবেশ নিষেধ"। এইখানেই আমরা দেখিতে পাইব শ্রমিককে খাটাইয়া কি উপায়ে পুঁজি শোষণের সাহায্যে নিজের আয়তন বৃদ্ধি করে। এই স্থানেই মুনাফা সৃষ্টির গুপ্ত-কৌশলটি আমরা আবিষ্কার করিব।

বাজারে শ্রমিক ও পুঁজিপতি দুইজনই স্বাধীন। ইহারা পৃথক পৃথক পণ্যের মালিক। বাজারে ইহারা মালিক হিসাবে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু শ্রম-শক্তি ক্রয় হইয়া গেলেই পুঁজিপতি সগর্বে কারখানা অভিমুখে ছুটিয়া যায়; শ্রমিক তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলে। পুঁজিপতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে—শ্রমিক একপদ অগ্রসর হইলে দুঁপদ পিছনে সরিতে চায়। কাহারো যদি এমন বুদ্ধি হয় যে নিজের শরীরের চামড়া খুলিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত মূল্য আনিবে, তাহা হইলে অনিবার্য মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু কি সে প্রত্যাশা করিতে পারে? শ্রমিকের ভাগ্যেও যে ইহাই আসন্ন তাহা বঝিতে তাহার বাকী থাকে না।

———

উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন

পুঁজিপতি শ্রম-শক্তি খরিদ করে তাহাকে ব্যবহার করিবার জন্য শ্রম-শক্তির ব্যবহার অথবা প্রয়োগকে বলিতে পারি 'শ্রম'। পুঁজিপতি শ্রমিক দ্বারা তৈয়ারী করায় বিশিষ্ট প্রকারের ব্যবহার-মূল্য। শ্রমিককে অবশ্য পুঁজিপতিই নিযুক্ত করে; তাহাকে খাটিতে হয় পুঁজিপতির মুনাফা সৃষ্টির জন্যই। এই উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনকার সময়ে অন্যযুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে পৃথক হইলেও, শ্রম প্রক্রিয়াটি সর্বত্র ও সকল সময়েই একই রকম। এই শ্রম-প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেই এখন আমরা আলোচনা করিব।

শ্রমের ভিতরে মানুষ এবং প্রকৃতি দুয়েরই অংশ রহিয়াছে। প্রকৃতির উপর মানুষ পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ক্রিয়া করে। মানুষ প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত একটি জীববিশেষ, অথচ আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পরিচালনা করিয়া ও মস্তিষ্কের শক্তি খাটাইয়া প্রকৃতিকে জয় করিয়া লইবার জন্য তাহার সহিত বিরোধিতার সম্পর্কে দাঁড়ায়। এইভাবে ক্রিয়া করিয়া নিয়ত সে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতেছে, তাহার চেহারা বদলাইয়া দিতেছে; শুধু তাই নয়, এই দ্রব্য-সম্ভারে সম্বদ্ধ হইয়া সে তাহার নিজের প্রকৃতিও পরিবর্তন করিতেছে। সক্রিয় মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিগুলিকে সজাগ করিয়া তুলিতেছে এবং ক্রমেই এই শক্তিগুলিকে আয়ত্তে আনিয়া সচেতনভাবে পরিচালনা করিতেছে। আমরা এখানে আদিম-যুগের শ্রম ব্যবস্থার সহজ রূপ সম্পর্কে আলোচনা করিব না; ইহা এত সহজ-সরল যে আমাদের পশুদের উৎপাদনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আদিম-যুগের এই শ্রমের রূপ এবং এখনকার যুগের শ্রম-শক্তির প্রয়োগ, এই দুয়ের ভিতরে ব্যবধান রহিয়াছে। আমরা এইখানে শুধু মানুষের শ্রমের কথাই বলিব। উর্ণনাভের তৈয়ারী জাল তন্তুবায়ের তৈয়ারী জালের সদৃশ। মৌমাছির তৈয়ারী চাক বড় বড় শিল্পীদেরও লজ্জা দেয়।

কিন্তু তাহা হইলেও নিকৃষ্টতম শিল্পী এবং সর্বোৎকৃষ্ট মৌমাছিতে প্রভেদ এইখানে যে, শিল্পী কাজ শুরু করিবার পূর্বেই যে জিনিস তৈয়ারী করিতে সে প্রস্তুত হয় সে সম্পর্কে মাথা খাটায় এবং পূর্ব হইতেই একটি ধারণা করিতে চেষ্টা করে। যে কোনও শ্রম-প্রক্রিয়ার উপসংহারে আমরা যে ফলাফলটি পাই তাহা কল্পনায় পূর্ব হইতেই শ্রমকারীর মস্তিষ্কে থাকে। উৎপাদন দ্বারা শুধু প্রকৃতিকেই যে সে পরিবর্তন করিতেছে তাহা নয়, যে উদ্দেশ্য সে সিদ্ধ করিতে যাইতেছে তাহা তাহার

শ্রমকেও নিয়ন্ত্রিত করে এবং সুপরিচালিত করে ; যথেচ্ছভাবে সে শ্রম করিতে পারে না।

শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উৎপাদনগুলি নিম্নোক্তরূপ—(১) শ্রমের বিষয় ; (২) শ্রম করিবার যন্ত্রপাতি।

যে সকল বস্তুকে মানুষ মাত্র প্রকৃতি হইতে উঠাইয়া লয় তাহাদের বলা যাইতে পারে শ্রমের বিষয় (object) এইগুলি প্রকৃতি হইতে মানুষ সংগ্রহ করে নিতান্তই অনায়াস-সাধ্য ভাবে—যেমন জলের মাছ, জঙ্গলের কাঠ। কিন্তু এই প্রকার শ্রমের বিষয় যদি পূর্বে শ্রমের ভিতর দিয়ে একটি স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহাকে বলিব কাঁচামাল। যেমন মদ তৈয়ারী করিতে চাউলের প্রয়োজন ; চাউল মদের কাঁচামাল—কেননা, চাউলকে পাওয়া গিয়াছে পূর্ব শ্রমের ফল-স্বরূপ, জঙ্গলের কাঠের মতন তাহাকে কুঁড়াইয়া পাওয়া যায় নাই। সকল কাঁচামালই শ্রমের বিষয়, কিন্তু সকল শ্রমের বিষয়ই কাঁচামাল নয়। তবে কাঁচামাল হইতে পারে যদি মাত্র একটি শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া ইহা যায়।

উৎপাদনের যন্ত্রপাতি শ্রমিকের শ্রম এবং শ্রমের বিষয়ের ভিতরে মধ্যস্থতা করে। কতকগুলি বস্তুর যান্ত্রিক, ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্মকে সে প্রয়োগ করে অপর কতকগুলি বস্তুকে আয়ত্ত করিবার জন্য। অনেক জিনিসই আমরা শুধুমাত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা দ্বারাই পাইতে পারি, যেমন গাছ হইতে ফল আহরণ ; এই জাতীয় খাদ্য আহরণের কথা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে মানুষ প্রথম হাত করে শ্রমের বিষয়কে নয়, উৎপাদনের যন্ত্রপাতিকে। এই যন্ত্রপাতি আমরা প্রকৃতি হইতে পাই ; এইভাবে প্রকৃতি মানুষের শ্রমের জন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ।

বাইবেল যতই বলুক না কেন যে, মানুষ কখনো তাহার সাড়ে

তিন হাত লম্বার আয়তন বদলাইতে পারে না, আমরা প্রত্যক্ষত দেখিতেছি প্রকৃতিকে হাতিয়ার স্বরূপ পাইয়া মানুষ তাহার স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সম্পূর্ণ করিয়াছে; তাহার আয়তন এবং সামর্থও বাড়িয়া গিয়াছে অনেকখানি। প্রকৃতি যেমন প্রথম হইতেই মানুষের মূল আশ্রয়স্থল, তেমনি তাহার যন্ত্রঘর। শ্রম-প্রণালী সামান্য যখন উন্নত হইয়াছে তখন হইতে শ্রমের জন্য প্রয়োজন হইয়াছে বিশেষ রকমের যন্ত্রপাতি। আধুনিক কালের গবেষণায় আদিম-যুগের গুহা-গহ্বরে প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার ও অস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। হাতিয়ার তৈয়ারী এবং তাহার প্রয়োগ যদি বা কোন কোন পশুর ভিতরে আমরা ক্ষুদ্র আকারে দেখিয়া থাকি, তথাপি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিয়া তাহার প্রয়োগ করা প্রধানত মানুষেরই বিশেষত্ব। যে সকল জীবজন্তু বিবর্তনের পথে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য যেমন গুহা-গহ্বর হইতে অস্থি উৎখননের প্রয়োজন হয়, তেমনি আদিম সমাজ সম্পর্কে সম্যক জানিবার জন্য প্রয়োজন হয় আদিম লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চিহ্নাবশেষের আবিষ্কার। বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগগুলির বিশেষত্ব ও প্রভেদ জানিতে হইলে বিশেষ করিয়া জানা প্রয়োজন কিরূপ যন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন যুগের লোকেরা ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিত। কি কি দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করিত তাহার তালিকা হইতে আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি না। যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইতে শুধু যে আমরা শ্রম করিবার প্রণালী কতখানি উন্নত হইয়াছে জানিতে পারি এমন নয়, যন্ত্রপাতির স্বরূপ দেখিয়া বলা যাইতে পারে, কিরূপ সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ হয়।

উৎপাদনের যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির বিষয়ের উপর কাজ করার অর্থ হইল এই যে মানুষ একটি পরিকল্পনা অনুসারে বস্তুর পরিবর্তন

ঘটাইয়া থাকে। শ্রম-প্রক্রিয়া নিঃশেষিত হয় শ্রমের ফলাফলের অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যেরই ভিতরে। এইখানে শ্রম শ্রমের বিষয়ের সহিত একীভূত হইয়া যায়; শ্রম বাস্তব রূপ নয়। শ্রমের বিষয় অপর একটি দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়।

এখন সমস্ত বিষয়টি যদি আমরা উৎপাদিত ফলাফলের দিক হইতে পরীক্ষা করি, তবে দেখিব শ্রমের যন্ত্রপাতি এবং শ্রমের বিষয় দুইই উৎপাদনের উপকরণ মাত্র; স্বয়ং শ্রম হইল উৎপাদনকারী শ্রম।

শ্রম-প্রক্রিয়া ব্যাপারটিকে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি; ব্যবহার-মূল্য প্রস্তুত করার জন্য ইহা প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রিয়া। মানুষ এবং প্রকৃতির ভিতরে আদান-প্রদানের জন্য এই ক্রিয়া অপরিহার্য। মানুষকে বাঁচিতে হইলে শ্রম অবশ্য কর্তব্য, ইহা একটি প্রাকৃতিক বিধি যেরূপ সমাজ ব্যবস্থায়ই হউক না কেন, মানুষকে শ্রম করিতেই হইবে; কেন না, শ্রম মানুষের শরীরে ধর্ম। এই বিচারে আমরা একদিকে মানুষ ও মানুষের শ্রম এবং অন্যদিকে প্রকৃতি ও প্রকৃতির বস্তু, এই দুটিকে পরস্পর সম্মুখীন করিয়া দেখিয়াছি। বার্লির স্বাদ যেমন বলিয়া দিতে পারে না, কে বার্লি তৈয়ারী করিয়াছে, ঠিক তেমনি শ্রম-প্রক্রিয়া আপনা হইতে কখনো বলিয়া দিতে পারে না, কিরূপ ব্যবস্থায় শ্রম প্রয়োগ করা হইয়াছে—দাস-প্রথায় অথবা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায়।

পুঁজিপতিকে আমরা বাজারে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম। সেখানে সে শ্রম-প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য যাবতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। এখন সে শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া উৎপাদনের উপকরণাদির সহিত ইহার সংযোগ করিয়া দিবে।

এইরূপ ব্যবস্থায় যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে, তাহার উপর শ্রমিকের কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না; ইহাদের মালিকানা সম্পূর্ণই পুঁজিপতির। সুতরাং, পুঁজিপতি খুবই লক্ষ্য রাখিবে যেন তাহার প্রদত্ত

উৎপাদনের উপকরণাদি শ্রমিক ঠিকমত ও যত্নের সহিত প্রয়োগ করে। উৎপাদনের জন্য ইহাদের যতখানি ব্যয় প্রয়োজন তাহার বেশী অযথা অপচয় পুঁজিপতির স্বার্থের প্রতিকূল।

পুঁজিপতি যে উৎপন্ন-দ্রব্য আত্মসাৎ করে তাহা ব্যবহার-মূল্য। তবে এই ব্যবহার-মূল্য সে নিজে ব্যবহার করে না, বিনিময়-মূল্যের মূল বলিয়াই ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করা হইয়াছে। পুঁজিপতির লক্ষ্য দুইটি—(১) সে ব্যবহার-মূল্য তৈয়ারী করিবে বিনিময়ের জন্য অর্থাৎ তাহার দ্রব্যকে সে পণ্যে পরিণত করিবে, (২) সে এমন পণ্য প্রস্তুত করিবে যাহার মূল্য যে সকল উপকরণ দ্বারা পণ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাদের সমষ্টিগত মূল্য হইতে অধিক। পুঁজিপতির উদ্দেশ্য খালিই ব্যবহার-মূল্য তৈয়ারী করা নয়, সেই ব্যবহার মূল্যকে পণ্যে পরিণত করার জন্যই দ্রব্যোৎপাদন; অর্থাৎ ব্যবহার মূল্যই শুধু নয়, মূল্য সৃষ্টি করাই তাহার উদ্দেশ্য; আরো তলাইয়া দেখিতে গেলে বুঝা যাইবে যে, মূল্য সৃষ্টিই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, পুঁজিপতির মূল লক্ষ্য হইল উদ্‌বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি। আমরা দেখিলাম, পণ্যগুলি একই সময়ে ব্যবহার-মূল্য ও মূল্য; শ্রম প্রক্রিয়ায়ও একই সময়ে পণ্যোৎপাদনও হয় এবং মূল্য সৃষ্টিও হয়।

আমরা জানি যে যতখানি শ্রম-সমাজ নির্ধারিত পরিমাপের অনুপাতে একটি পণ্যে দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। ১০ পাউণ্ড সূতা তৈয়ারীর জন্য প্রথম প্রয়োজন হইাছে কাঁচামাল এই ক্ষেত্রে ধরা যাউক ১০ পাউণ্ড তুলা এই কাঁচামাল। পুঁজিপতি ১০ শিলিং খরচ করিয়া এই তুলা ক্রয় করিয়াছে; এই ১০ শিলিংকে ধরা যাইতে পারে তুলার মূল্য। টাকু প্রভৃতি যন্ত্রপাতির জন্য পুঁজিপতিকে খরচ করিতে হইয়াছে ২ শিলিং। এখন যদি দশ শিলিং ও দুই শিলিং—এই ১২ শিলিংএ মোট ২৪ ঘণ্টার শ্রম অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা করিয়া

২ দিনের শ্রম থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সুতার ভিতরে দুই দিনের শ্রম এবং তদনুযায়ী মূল্য পূর্ব হইতেই থাকিবে। এইখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১০ পাউণ্ড সুতা তৈয়ারীতেই সবটুকু টাকু খরচ হইয়া যায় নাই; টাকুর সম্পূর্ণ মূল্যের যে অংশটুকু সুতার ভিতর ঢুকিয়াছে তাহা মাত্র ২ শিলিংএর।

এখন দেখিতে হইবে সুতার মোট মূল্যের কত অংশ তন্তুবায় তাহার শ্রমদ্বারা তুলায় সংযোগ করিয়াছে। তন্তুবায় ৬ ঘণ্টা কাজ করিলেই ১০ পাউণ্ড তুলাকে ১০ পাউণ্ড সুতায় পরিবর্তিত করিতে পারে। তাহা হইলে অতীত শ্রম ও নূতন শ্রম মিলিয়া সুতার ভিতরে সর্বশুদ্ধ রহিয়াছে আড়াই দিনের শ্রম, অথবা ১৫ শিলিং পরিমাণের মূল্য।

এই ফলাফল হইতে দেখা গেল যে, যে ১৫ শিলিং পুঁজিপতি প্রথম বাজারে খাটাইয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যই সে ফিরিয়া পাইয়াছে। মূল্যের প্রসার হইল না, মূল্যবৃদ্ধি হইল না, উদ্বৃত্তমূল্য জাত হইল না। সুতরাং মুদ্রা রূপান্তরিত হইয়া, পুঁজির রূপ ধারণ করিতে পারিল না। ১৫ শিলিঙের ১০ শিলিং তুলায়, ২ শিলিং যন্ত্রপাতিতে আর ৩ শিলিং শ্রম শক্তির জন্য দেওয়া হইয়াছে। এই সবগুলিকে মিলাইয়া ১৫ শিলিংই হইল বটে, কিন্তু তাহা হইতে পুঁজিপতির জন্য কিছুমাত্র লাভ জন্মাইল না।

পুঁজিপতি একদিনের জন্য শ্রম-শক্তি ক্রয় করিয়াছে; ইহার একদিনের মূল্য ৩ শিলিং। এই তিন শিলিঙের মূল্য শ্রমিককে ছয় ঘণ্টা খাটাইয়াই সে তুলিয়া লয়। এখন সে হিসাব করে, একদিনের জন্য যখন শ্রম-শক্তি ক্রয় করিয়াছি এবং একদিনের জীবনধারণোপযোগী তিন শিলিং যখন তাহাকে দেওয়াই হইল তখন আরো ৬ ঘণ্টা অর্থাৎ মোট ১২ ঘণ্টা তাহাকে খাটাইতে আপত্তি কি? সুতরাং দেখা গেল, শ্রম-শক্তির মূল্য তিন শিলিং এবং ১২ ঘণ্টা খাঁটিয়া একদিনে শ্রমিক

যে মূল্য উৎপাদন করে, অর্থাৎ ৬ শিলিং—এই দুইটি বিভিন্ন পরিমাণের পুঁজিপতি বাজারে শ্রম-শক্তি ক্রয় করিবার সময়ই এই প্রভেদটির উপর লক্ষ্য রাখে; কেননা, শ্রম-শক্তির মূল্য এবং শ্রম-শক্তির প্রয়োগ দ্বারা যে মূল্য উৎপাদিত হয় তাহার প্রভেদ হইতেই পুঁজিপতির মুনাফার সৃষ্টি। শ্রম-শক্তির প্রয়োগ দ্বারা ব্যবহার-মূল্য প্রস্তুত করাই কখনো পুঁজিপতির লক্ষ্য হইতে পারে না। শ্রম-শক্তির একটি বিশেষ ধর্মের উপরেই তাহার দৃষ্টি—শ্রম-শক্তি খালি মূল্যেরই উৎস নয়, নিজের মূল্যের চাইতেও অধিক মূল্য সৃষ্টির ইহাই মূল। এই অধিক মূল্য সৃষ্টির প্রত্যাশায় পুঁজিপতি শ্রমিকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। সমান মূল্যের ভিতরেই বিনিময় হইতে হইবে, এই বাজার-বিধি মানিয়া চলিতে পুঁজিপতি মোটেই কুণ্ঠিত নয়। যাহার যতখানি মূল্য পুঁজিপতি তাহা পুরাপুরিই দিয়াছে; শ্রমিককেও দেওয়া হইয়াছে তাহার শ্রম-শক্তির মূল্য; বাঁচিয়া থাকার জন্য যতখানি আবশ্যক তাহা সে পাইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রমিককে শ্রম-শক্তির মূল্য উৎপাদনের জন্য যত শক্তি প্রয়োজন অর্থাৎ মাত্র ৬ ঘণ্টা না খাইয়া আরো অধিক খাটানো সম্ভব। যদি আরো ৬ ঘণ্টা খাটুনি বাড়াইয়া দেওয়া যায় অর্থাৎ মোট ১২ ঘণ্টা খাটানো যায়, তাহা হইলে আনুষঙ্গিক উপকরণাদির পরিমাণও তদনুরূপ অর্থাৎ দ্বিগুণ বাড়াইতে হইবে। এই আনুষঙ্গিক উপকরণাদির মূল্য এখন ১২ শিলিং না হইয়া ২৪ শিলিং হইবে। ৬ ঘণ্টা খাটাইয়া আরো ৩ শিলিংএর মূল্য তাহাতে যুক্ত করা হইল; ইহা শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান। ইহার পরেও ৬ ঘণ্টা বেশী খাটাইয়া আরো তিন শিলিংএর মূল্য উৎপাদন করা হইল। মোট মূল্য উৎপাদন হইল ৩০ শিলিঙের। কিন্তু এই ৩০ শিলিঙের ২৭ শিলিঙের উপর তাহার কোনও হাত নাই। কেননা, বাজারে

শ্রম-শক্তি এবং অন্যান্য উপকরণাদি ক্রয় করিতে সে যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা এই ২৭ শিলিঙের সমান। বাকী তিন শিলিং তাহার মুনাফা, পুঁজিপতির লভ্যাংশ অথবা উদ্বৃত্ত-মূল্য।

সকল দিকই রক্ষা হইল; বাজারে বিনিময়ের বিধিও মানিয়া চলা হইল, সকলকেই তাহার মূল্য অনুরূপ যাহা প্রাপ্য তাহা দেওয়া হইল; পুঁজিপতিরও কোন আফশোস রহিল না, সে তাহার বিনা-আয়াস সাপেক্ষ অতি-বাঞ্ছিত উদ্বৃত্ত-মূল্য পাইল।

উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে আমরা শ্রম-প্রক্রিয়া ও মূল্যোৎপাদন-প্রক্রিয়া এই দুয়ের সমন্বয় হিসাবে দেখিতে পারি; কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে আমরা শ্রম-প্রক্রিয়া এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের ঐক্যস্থল হিসাবেই দেখিব।

শ্রম-প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ উপকরণগুলি মূল্য-সৃষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন ভূমিকা সম্পাদন করে।

শ্রমিক তাহার শ্রমের বিষয়ের সহিত নূতন শ্রম যোগ করে এই শ্রমের বিশেষ-রূপ ও উপযোগ যাহাই হউক না কেন। পক্ষান্তরে, উৎপাদনের উপকরণগুলি শ্রম-প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত হইলেও তাহাদের মূল্য নূতন উৎপাদিত দ্রব্যে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। এই উপকরণগুলির মূল্য যে দ্রব্য নূতন উৎপাদিত হইল তাহার গোটা মূল্যের অংশ-বিশেষ। তুলা এবং সুতাকাটার যন্ত্র তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব হারাইল বটে, কিন্তু নূতন উৎপাদিত দ্রব্য সুতায় ইহাদের মূল্য সংরক্ষিত হইল। এই দ্রব্যান্তর সংঘটিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ এই সকল উপকরণগুলির অন্য দ্রব্যে পরিবর্তনের সময়। এই অবস্থাটি আনয়ন করে শ্রম, কিন্তু কি উপায়ে?

শ্রমিক একই সময়ে দুইটি পৃথক পৃথক কাজ করে না; প্রথম, তুলায় মূল্য সংযোজন; দ্বিতীয়, উৎপাদনের উপকরণগুলির মূল্য-সংরক্ষণ। নূতন মূল্য সংযোজন-ক্রিয়া দ্বারাই সে পুরাতন মূল্য সংরক্ষণ

করিয়া যাইতেছে। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রমের দুইটি প্রকৃতি রহিয়াছে, একই সময় একটি শ্রম-প্রক্রিয়ার ভিতরে মূল্য-সংযোজন করিতে গিয়া সে মূল্য-সংরক্ষণও করিতেছে।

এখন কথা উঠিবে, এই মূল্য-সংযোজন কি ভাবে হয়? স্পষ্টতই দেখা যায়, বিশেষ রূপের শ্রম দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন করিয়াই ইহা সম্পন্ন হইতেছে। তন্তুবায় সূতা কাটিয়া, মুচি জুতা তৈয়ারী করিয়া এই মূল্য-সংযোজন কার্যটি সম্ভব করিতেছে। তাহা হইলে দেখা গেল, ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করিয়া তবে মূল্য সংযোজন সম্ভব হইতেছে শ্রমের একটি বিশেষ রূপে,—যেমন সূতা কাটায় দেখা যায়। এই নূতন উৎপাদিত দ্রব্যের ভিতরে তুলা এবং সূতাকাটার যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারাই হইল নূতন দ্রব্য তৈয়ারীর উপাদান।

আমরা পূর্বেই জানি, নূতন ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করিতে যে সকল ব্যবহার-মূল্যকে উপাদান রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের মূল্য নূতন দ্রব্যের মোট মূল্যেরই অংশ। ইহাদের ভিতরে যতখানি শ্রম রহিয়াছে, তাহাই দ্রব্যান্তরিত হইয়া নূতন দ্রব্যে আশ্রয় লইয়াছে। এতকাল ইহারা নিষ্ক্রিয় হইয়াই ছিল, সজীব শ্রমের সংযোজনে ইহারা নূতন শ্রম-প্রক্রিয়ায় নূতন দ্রব্য উৎপাদনে তৎপর ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল শ্রমের বিশেষ রূপ ছাড়াও একটি সাধারণ রূপ আছে বলিয়াই অর্থাৎ শ্রম মানুষের শ্রম-শক্তির ব্যয় বলিয়াই, সূতাকাটারূপ বিশেষ শ্রমটি তুলা এবং সূতাকাটার যন্ত্রপাতিতে নূতন মূল্য সংযোজন করিতে পারিল। কিন্তু অপরদিকে এই শ্রমের বিশেষ রূপটির জন্যই অর্থাৎ মানুষের শ্রম-শক্তির ব্যয় একটি বিশেষ প্রকারে সংঘটিত হয় বলিয়াই, সূতাকাটারূপ শ্রম-শক্তির ব্যয়ে আমরা লক্ষ্য করি

যে ইহা যেমন উৎপাদনের উপকরণগুলির মূল্য দ্রব্যান্তরিত করিতেছে, তেমনি এই নূতন দ্রব্যের ভিতরে মূল্যও সংরক্ষণ করিতেছে।

ধরা যাউক যে যন্ত্রপাতির নূতন আবিষ্কারের জন্য শ্রমিক পূর্বে ৩৬ ঘণ্টায় যে পরিমাণ সূতা কাটিত, তাহা সে এখন ৬ ঘণ্টায়ই কাটিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের উৎপাদন-শক্তি এখন ছয়গুণ বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৬ ঘণ্টায় পূর্বে সে কাটিত ৬ পাউণ্ড সূতা; এখন কাটে ৩৬ পাউণ্ড। পূর্বে ছয় পাউণ্ড সূতায় যে শ্রম দেওয়া হইত তাহা এখন দেওয়া হয় ৩৬ পাউণ্ডে। ১ ঘণ্টার যায়গায় প্রতি পাউণ্ডে এখন $\frac{১}{৬}$ ঘণ্টা দিলেই চলে। ৬ ঘণ্টা সূতা কাটিয়া এখন যে কাঁচামালের মূল্য দ্রব্যান্তর করা হয় তাহা পূর্ব হইতে ৬ গুণ বেশী। ৬ ঘণ্টা সূতা কাটিয়া যে কাঁচামালের মূল্য দ্রব্যান্তর ও সংরক্ষণ করা হইল তাহা ছয়গুণ বেশী বটে, কিন্তু প্রতি পাউণ্ডে কাঁচামালে যে নূতন শ্রম-সংযোজন হইল তাহা পূর্বের $\frac{১}{৬}$ অংশ। কম সময়ে বেশী কাজ হইলে মূল্য-সংরক্ষণ হয় বেশী, সংযোজন হয় কম।

এই বিচারে আমরা দেখিলাম, উৎপাদনের উপকরণগুলি সূতাকাটার কাজে লাগিয়া তাহাদের পূর্ব ব্যবহার-মূল্যের রূপটিকে হারাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মূল্য সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহারা নূতন একটি দ্রব্য উৎপাদনের কাজে লাগিয়া নূতন ব্যবহার-মূল্যের রূপ লইয়াছে। কিন্তু উৎপাদনের সকল উপকরণগুলির ব্যবহার-মূল্য যেমন একভাবে বিনষ্ট হয় না, তেমনি একই প্রকারে তাহাদের মূল্যও সংরক্ষিত হয় না। কয়লা যখন জ্বলিতে শুরু করে তাহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হয়। সকল প্রকার কাঁচামালের বেলায়ই ইহা খাটে। কিন্তু যন্ত্রপাতি কখনো একটি শ্রম-প্রক্রিয়াতেই বিলুপ্ত হয় না। ইহাদের সবটুকু মূল্য একটি শ্রম-প্রক্রিয়াতেই দ্রব্যান্তরিত হইয়া সংরক্ষিত হয় না। দিন দিনই যন্ত্রপাতির ক্ষয় হইতেছে সত্য কিন্তু প্রতিদিনই পূর্ব চেহা

লইয়া ইহারা কাজে ব্রতী হয়। একটি সূতাকাটার যন্ত্রের আয়ু দশ বৎসর হইলে, স্পষ্টতই আমরা দেখি যে দশ বৎসরে যত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ইহার মূল্য দিনে দিনে দ্রব্যান্তরিত হইয়াছে। যন্ত্রপাতির জীবনকে মানুষের জীবনের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে। প্রতিদিন মানুষ ২৪ ঘণ্টা করিয়া মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছে; কিন্তু খালি মুখের চেহারা দেখিয়াই বলা চলে না আর কতদিনে তাহার আয়ু নিঃশেষিত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বীমা কোম্পানীগুলি মানুষের মৃত্যুর তারিখের গড়পড়তা হিসাব করিয়া মুনাফা অর্জন করিতেছে না? শ্রমের যন্ত্রপাতির বেলায়ও তাহাই খাটে। অভিজ্ঞতা দ্বারা যন্ত্রপাতির আয়ুর গড়পড়তা হিসাব জানা সম্ভব হয়। ধরা যাউক যেন একটি যন্ত্রের ব্যবহার-মূল্য শ্রম-প্রক্রিয়ায় ৬ দিনেই নিঃশেষিত হয়। তাহা হইলে প্রতিদিন বিনষ্ট হয় $\frac{১}{৬}$ অংশ ব্যবহার মূল্য; তদনুযায়ী যে মূল্য দ্রব্যান্তরিত ও সংরক্ষিত হয় তাহাও $\frac{১}{৬}$ অংশ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে যন্ত্রপাতি তাহাদের সম্পূর্ণ দেহ লইয়াই প্রতিদিনের শ্রম-প্রক্রিয়ার ভিতরে উপস্থিত হয়, অথচ ইহাদের মূল্য দ্রব্যান্তরিত ও সংরক্ষিত হইতেছে ধীরে ধীরে।

সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, যন্ত্রপাতি কখনো তাহাদের ব্যবহার-মূল্যের বিনাশ হওয়ায় যতখানি মূল্য হারাইতেছে তাহার অধিক মূল্য দ্রব্যান্তরিত ও সংরক্ষণ করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি যদি কোনও মূল্য না হারায় এবং অন্য দ্রব্যে তাহা সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহাদের কোনও মূল্যই নাই অর্থাৎ ইহারা মানুষের শ্রমোৎপাদিত নয়। ইহারা নূতন দ্রব্যোৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে, বিনিময়-মূল্য গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে কোন হাত ইহাদের নাই।

শ্রমিক একই শ্রম-প্রক্রিয়ায় যেমন মূল্য-সংরক্ষণও করিতেছে, তেমনি

আবার মূল্য-সংযোজনও করিতেছে—তাহার জন্য তাহাকে দুইবার শ্রম করিতে হয় না, পুঁজিপতিকেও অতিরিক্ত খরচ কিছুই বহন করিতে হয় না। শিল্প-ব্যবসায় যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চলে, ততক্ষণ পুঁজিপতি মুনাফা সংগ্রহে এত ব্যস্ত থাকে যে শ্রমের এই দানের কথা স্মরণ করিবার সময়ই তাহার থাকে না। সঙ্কট ও দুঃসময় উপস্থিত হইলে এই ঘটনাটি স্মরণ করিবার সুযোগ তাহার ঘটে। সঙ্কটের সময়ে সহসা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় অনেকখানি বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া উৎপাদনও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ফলে, যে সকল কাঁচামাল পুঁজিপতি পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে সেগুলি এবং যন্ত্রপাতি বিনা ব্যবহারে নষ্ট হইতে থাকে। উৎপাদন নাই বলিয়াই ইহাদের মূল্য দ্রব্যান্তর হইয়া সংরক্ষিত হইবার সুযোগ পায় না। নিরন্তর উৎপাদনের কার্য না হইলে অপচয় অবশম্ভাবী। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে দেখা গেল যথার্থত ব্যবহৃত ও বিনষ্ট হইয়াছে ইহাদের ব্যবহার-মূল্য, মূল্য নয়। সুতরাং মূল্যের পুনঃ সৃষ্টি হইয়াছে বলা ঠিক নয়; নূতন-উৎপাদিত দ্রব্যে এই মূল্য মাত্র পুনঃ প্রকাশিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে—এইরূপ বলাই ঠিক। উৎপাদন হইয়াছে নূতন দ্রব্যের; এই নূতন দ্রব্যে পুরাতন বিনিময়-মূল্যের মাত্র পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে।

শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রম-শক্তির প্রয়োগের কথা স্বতন্ত্র। ধরা যাউক যেন শ্রমিককে মাত্র ছয় ঘণ্টাই খাটানো হইয়াছে; যে মূল্য সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার সহিত সংযুক্ত হইল এই নূতন মূল্য; এই মূল্যের অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণই মৌলিক। কিন্তু আমরা ভুলি নাই যে শ্রম-শক্তি ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থ পুঁজিপতি খরচ করিয়াছে, এই মূল্য তাহারই সমান; এই খরচেরই পরিবর্তে সে পাইয়াছে শ্রম-শক্তি। আমরা পূর্বেই জানি, ছয় ঘণ্টার অধিক সময়

শ্রমিককে খাটানো সম্ভব। শ্রম-শক্তির প্রয়োগ দ্বারা শ্রম-শক্তির মূল্যের সমান মূল্যই যে খালি উৎপাদিত হইয়াছে তাহাই নয় ইহারও অধিক মূল্য সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে। সমগ্র দ্রব্যটির যে মূল্য তাহা হইতে উৎপাদনের উপকরণাদির মূল্য বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল উদ্বৃত্ত-মূল্য অথবা পুঁজিপতির মুনাফা। একদিকে শ্রম-শক্তি ও অপরদিকে উৎপাদনের উপকরণ,—শ্রম-প্রক্রিয়ার এই সকল বিভিন্ন উপাদানে পুঁজিপতি তাহার মুদ্রাকে পরিবর্তিত করিলে মূল পুঁজি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতিকে বলা হয় পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ, অথবা শুধুমাত্র অপরিবর্তমান পুঁজি।

অন্যদিকে পুঁজির যে অংশটুকুকে শ্রম-শক্তিতে পরিবর্তন করা হইয়াছে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ভিতরে তাহার মূল্যের পরিবর্তন হইতে পারে। শ্রম-শক্তির প্রয়োগ আপন মূল্যের সমান মূল্য পুনরুৎপাদন করিয়াও উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। ইহাকে বলা যাইতে পারে, পুঁজিপতি পরিবর্তমান অংশ। শ্রম প্রক্রিয়ার দিক হইতে উৎপাদনের যে সকল উপকরণকে আমরা বস্তু-উপকরণ (কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি) ও মনুষ্য উপকরণ (শ্রম-শক্তি) আখ্যা দিয়াছি, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ার দিক হইতে তাহাদেরই আমরা বলিতে পারি, অপরিবর্তমান পুঁজি ও পরিবর্তমান পুঁজি।

পুঁজিপতি প্রথমে যে পুঁজি খাটায় তাহাকে আমরা 'C' এই সাংকেতিক চিহ্নটির দ্বারা বুঝাইতে পারি। এই 'C'র দুই অংশ—একটি উৎপাদনের উপকরণ; ইহাকে আমরা বলিব ছোট 'c'; অন্যটি শ্রম-শক্তি, ইহার নাম দিব 'V'। 'c' পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ আর 'V' পুঁজির পরিবর্তমান অংশ। সমগ্র পুঁজি অর্থাৎ 'C' হইল 'c' এবং 'V'র সমষ্টি। সমগ্র পুঁজির পরিমাণ যদি হয় ৫০০ পাউণ্ড,

আর ইহার অপরিবর্তমান অংশ হয় ৪১০ পাউণ্ড এবং পরিবর্তমান অংশ হয় ৯০ পাউণ্ড, তাহা হইলে সমীকরণটি দাঁড়ায় নিম্নোক্তরূপ ঃ

৫০০ প্যাউণ্ড = ৪১০ পাঃ + ৯০ পাঃ

উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে নূতন উৎপাদিত-দ্রব্যের মোট মূল্য হইয়াছে "$c+v+s$ অথবা (৪১০ পাঃ + ৯০ পাঃ) + ৯০পাঃ = ৫৯০ পাঃ, 's' = ৯০ পাঃ—এইখানে উদ্বৃত্ত-মূল্য মুল পুঁজির পরিমাণ বাড়াইয়া C হইতে Cএ পরিণত হইল।

আমরা দেখিলাম, $C=c+v$, $C=(c+v)+s$.

অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্য দ্রব্যান্তর হইয়া নূতন দ্রব্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ভিতরে যে নতুন-মূল্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইল $v+s$, শ্রম-শক্তি মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের সমষ্টি। "C" অপরিবর্তমান বলিয়াই ইহাকে আমরা পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির প্রয়োজনে শূন্য ভাবিয়া লইতে পারি। উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিবর্তমান পুঁজি অর্থাৎ Vর ভিতরে পরিবর্তনের ফলাফল। V'র এই পরিবর্তনকে আমরা সহজ করিয়া বলিতে পারি যে ৬ ঘণ্টা শ্রমিককে কাজ করাইয়া শ্রম-শক্তির মূল্য উঠাইয়াও আরো বেশী তাহাকে খাটানো সম্ভব। তাহাতে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে অপরিবর্তমান পুঁজিকে শূন্যের সহিত সমীকৃত করায় উদ্ভট ঠেকিতে পারে ; অথচ ইহাই আমরা প্রতিদিন কার্যত করিতেছি। বস্ত্রব্যবসায় হইতে কোন একটি বৎসরে ইংলণ্ডের কত মুনাফা হইল যদি আমরা তাহার হিসাব করি. তবে প্রথমই ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে তুলা ইত্যাদি বাবদ যে খরচ হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া লই। এই বাদ দেওয়ার অর্থ হইল, নূতন দ্রব্যের ভিতরে যে মূল্য সংরক্ষিত হইয়াছে তাহাকে শূণ্যের সমানই ধরিলাম।

সমগ্র দ্রব্যটির মূল্য হইতে অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্যের অংশ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে $v+s$ অর্থাৎ ১৯০ পাঃ। ইহা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্ট মূল্য ; ইহার ভিতরে উদ্বৃত্তমূল্যের পরিমাণ ৯০ পাঃ পরিবর্তমান পুঁজি শতকরা কি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই হিসাবকে দেখিয়া বুঝিতে হইবে s, v'র কত অংশ। পরিবর্তমান পুঁজির মূল্যের আপেক্ষিক বৃদ্ধি অথবা উদ্বৃত্ত মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণকে $\frac{S}{V}=\frac{৯০}{৯০}$ ১০০ পার্সেণ্ট—এই ভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই আপেক্ষিক পরিমাণকে সহজ কথায় বলা চলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। অধিক খাটুনিটুকুর পরিমাণ ৬ ঘণ্টা না হইয়া যদি ৩ ঘণ্টা হইত এবং মোট খাটুনি হইত ৯ ঘণ্টা তাহা হইলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নামিয়া আসিত ৫০ পার্সেণ্টে। আবার ৬ ঘণ্টা না হইয়া ১২ ঘণ্টা যদি হইত এবং মোট খাটুনি হইত ১৮ ঘণ্টা তাহা হইলে এই হার উঠিয়া আসিত ২০০%-এ।

৬ ঘণ্টা খাটিয়া শ্রমিককে ৩ শিলিঙের মূল্য উঠাইতে হয় শ্রম-শক্তির জন্য। যে সকল ব্যবহার্য শ্রমিকের চাই, যদি ইহাদের দাম কমিয়া যায় তাহা হইলে শ্রম-শক্তির মূল্যও সেই অনুপাতে কমিবে। আবার ব্যবহার্যের মূল্য বাড়িলে, শ্রম-শক্তির মূল্যও বাড়িবে ; শ্রম-শক্তির মূল্য উঠাইবার জন্য শ্রমিককে খাটিতেও হইবে অধিক সময়। এই মূল্য উঠাইবার জন্য যে সময় শ্রমিককে খাটিতে হয় তাহার পরিমাণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি ৬ ঘণ্টা। পুঁজিপতির জন্য না খাটিয়া স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকার জন্য খাটিলেও এই ৬ ঘণ্টা তাহাকে খাটিতেই হইত। এই খাটুনিতে যে মূল্য উৎপাদন হইল, তাহা V অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্যের সমান। যে সময়টুকু শ্রমিককে খাটিতেই হইবে আপন শ্রম-শক্তির মূল্যটুকু উৎপাদনের জন্য, তাহাকে বলা হয় 'আবশ্যক শ্রম-সময়'। জীবিকার জন্য এই সময়টুকু খাটিতেই হয়।

শ্রম-প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তরে শ্রমিক শ্রম করে সত্য কিন্তু তাহা কখনো তাহার নিজের জীবিকার জন্য প্রয়োজন নাই। ঐ সময়ে সে পুঁজি-পতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিপতির নিকট এই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণই শূন্য হইতে, ইহার জন্য তাহার কোনও খরচ নাই। এই সময়টুকুকে আমরা বলিতে পারি উদ্বৃত্ত-সময়। দাস-প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া এবং মজুর-প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া যে অর্থনৈতিক যুগ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের ভিতরের মূলগত প্রভেদ আবিষ্কার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কি ভাবে প্রকৃত উৎপাদনকারী হইতে এই উদ্বৃত্ত-সময়টি আদায় করিয়া লওয়া হয়।

পুঁজি কর্তৃক শ্রম-শক্তিকে যে পরিমাণে শোষিত হইতে হইতেছে তাহার মাত্রা আমরা উদ্বৃত্ত-মুল্যের হার দ্বারাই বুঝিতে পারি।

আমরা পূর্ব উদাহরণটি হইতে দেখিয়াছি, S'-কে V'র অনুপাতে দেখিয়াই তবে শোষণের হার নির্ধারণ করিতে হয়। কিন্তু পুঁজিপতিরা S-কে c+v'র সহিত অনুপাত করিয়া দেখাইতে চায়, তাহারা যাহা সংগ্রহ করে তাহার পরিমাণ কত অল্প।

$$\frac{S}{c+v} = \frac{৯০}{৪১০+৯০} = \frac{৯০}{৫০০} = ১৮\%$$

অথচ আমাদের হিসাবে শোষণের মাত্রা হইয়াছে ১০০%। এই প্রসঙ্গে আমাদের শুধু এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন, S-কে c+v'র সহিত অনুপাত করিলে আমরা মুনাফার হারটিই জানিতে পারি—তাহা কখনো উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারও নয়, শোষণের মাত্রার পরিচায়ক নয়।

শ্রম-শক্তির ক্রয় ও বিক্রয় হয় তাহার উপযুক্ত মূল্যে, এই অনুমান হইতেই আমরা বিচার শুরু করিয়াছিলাম। সকল পণ্যের মূল্য যেমন নিরূপিত হয়, তেমনি ইহারও মূল্য নির্ধারিত হয়। যে সময়টুকু শ্রম-শক্তির উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন তাহা দ্বারা। প্রতিদিনের জীবিকার

জন্য যদি ছয় ঘণ্টা খাটা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রতিদিনের শ্রমশক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের জন্য তাহাকে এই সময়টি খাটিতে হইবে। আমরা এখানে 'আবশ্যক শ্রম-সময়ের' পরিমাণ ছয় ঘণ্টা ধরিয়া লইলাম, কিন্তু প্রতিদিন মোট কত ঘণ্টা খাটিতে হইবে তাহা এখনও আমরা জানিতে পারিলাম না। ধরিয়া লওয়া যাউক যে A—B রেখাটির দৈর্ঘ্য "আবশ্যক শ্রম-সময়ের" অথবা ছয় ঘণ্টার নির্দেশক। যদি এই ছয় ঘণ্টাকে যথাক্রমে এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা ও তিন ঘণ্টায় বাড়ানো হয় তাহা হইলে আমাদের আরো তিনটি রেখা আঁকিতে হইবে। ১নং শ্রমদিবস, A—B—C ; ২নং শ্রমদিবস A—B—C ; ৩নং শ্রমদিবস A—B—C ; শ্রমদিবস হইল যথাক্রমে ৭ ঘণ্টা, ৯ ঘণ্টা ও ১২ ঘণ্টা। তিনটি লেখ্যতেই B—C হইল A—B'র বিস্তার মাত্র। এই B—C উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। শ্রমদিবস A—B এবং B—C'র সমষ্টি বলিয়াই ইহার অবস্থান্তর হয় B—C'র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। A—B অপরিবর্তমান বলিয়াই B—C, A—B'র কত অংশ তাহা গণনা করা সম্ভবপর। প্রথম শ্রমদিবসে ইহা $\frac{১}{৬}$; দ্বিতীয় শ্রমদিবসে $\frac{৩}{৬}$; তৃতীয় শ্রমদিবসে $\frac{৬}{৬}$; আমরা জানি যে 'উদ্বৃত্ত—শ্রম-সময়' ও 'অবশ্য শ্রম-সময়ের' সম্বন্ধই হইল উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ; আমাদের লেখ্যটিতে B—C ও A—B'র সম্বন্ধ দ্বারাই তাহা নিরূপিত হইবে। তিনটি বিভিন্ন শ্রমদিবসে উদ্বৃত্ত মূল্যের এই হার যথাক্রমে ১৬$\frac{২}{৩}$%, ৫০% ও ১০০% হইয়াছে। খালি উদ্বৃত্ত মূল্যের হার জানিলেই আমরা কত ঘণ্টার শ্রমদিবস তাহা জানিতে পারি না। ১০০% যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হয়, তাহা হইলে শ্রমদিবস ৮ ঘণ্টা, ১০ ঘণ্টা, ১২ ঘণ্টা অথবা আরো বেশী ঘণ্টারও হইতে পারে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার কতখানি তাহা দেওয়া থাকিলে আমরা শুধু এতটুকুই বুঝিতে পারি যে "আবশ্যক শ্রম-সময়" ও 'উদ্বৃত্ত

শ্রম-সময়' দুইই সম-পরিমাণ ; ইহারা যে কত ঘণ্টা পরিমাণের তাহা বুঝিতে পারি না।

শ্রমদিবস, তাহা হইলে, অপরিবর্তমান নয়, ইহা পরিবর্তন-সাপেক্ষ। এই শ্রমদিবসের একটি অংশ অবশ্য শ্রমিকের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য যত সময় প্রয়োজন হয় তাহার দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে। অপর অংশটি এবং সমগ্র শ্রমদিবসটি নির্দিষ্ট হইবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দ্বারা।

শ্রমদিবসের নির্দিষ্ট সীমা রহিয়াছে। অধমমান হইল সমস্ত B—Cটিকে বিলোপ করিয়া দেওয়া, তাহা হইলে থাকে শুধু A—B। শ্রমদিবসকে 'আবশ্যক শ্রম-সময়ের' সমান করিয়া রাখা পুঁজিপতির স্বার্থ নয় ; সুতরাং উদ্বৃত্ত-শ্রমসময়কে সম্পূর্ণ বিলোপ করা পুঁজিপতির স্বার্থ বহির্ভূত। চরমমান হইল B—Cকে যথাসম্ভব বাড়াইয়া সমগ্র শ্রমদিবসকে ২৪ ঘণ্টার কাছাকাছি লইয়া যাওয়া। অবশ্য ২৪ ঘণ্টা কখনো শ্রমদিবস হইতে পারে না। কেননা তাহা শ্রমিকের শারীরিক সামর্থ্যের বাহিরে। ইহা ছাড়াও, শ্রমিককে যথেচ্ছ খাটানোর বিরুদ্ধে একটি নৈতিক দিকও আছে—শ্রমিক তাহার মানসিক ও সামাজিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্যও সময় দাবী করিতে পারে। শ্রমিকের স্বপক্ষে এই দুইটি যুক্তি থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই শ্রমদিবস ৮ঘণ্টারও যেমন হয় আবার ১৮ ঘণ্টাব্যাপীও হইতে পারে।

পুঁজিপতি শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়াছে দৈনিক হারে। সে একটি পুরা শ্রমদিবসব্যাপী এই শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করিতে পারে ; শ্রমিকের উপর এই অধিকার সে অর্জন করিয়াছে। কিন্তু শ্রমদিবসটি কি ?

যেমনই হউক, এই শ্রমদিবসকে স্বাভাবিক দিনটির আয়তন হইতে কম হইতেই হইবে। কিন্তু কত কম ? শ্রমদিবসটির আয়তন সম্পর্কে পুঁজিপতির নিজস্ব একটা মতামত আছে। তাহার নিজের আত্মা পুঁজিরই আত্মা। কিন্তু পুঁজির জীবনের একমাত্র প্রেরণা মূল্য এবং

উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টি। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহার অপরিবর্তমান অংশটি দ্বারা অর্থাৎ উৎপাদনের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত-শ্রম ব্যবহার করা।

পুঁজি পুরাতন জড়ীভূত শ্রম; কিন্তু ইহা বাঁচিয়া থাকে সজীব শ্রমের রক্ত চুষিয়া। যত বেশী রক্ত সে শুষিয়া লইতে পারিবে ততই ইহার আয়ুবৃদ্ধি হইবে। যে সময়টি শ্রমিক কাজ করে তাহা হইল পুঁজিপতিদ্বারা তাহার ক্রীত শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহার মাত্র। বাজারে শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া কারখানায় তাহাকে যথেচ্ছ খাটানোর জন্য এত বেশী কায়িক অপচয় হয় যে, যে মূল্য শ্রমশক্তির জন্য দেওয়া হয় তাহা দ্বারা শ্রমিক তাহার অপচয়কে পুরাইয়া লইতে পারে না। পুঁজিপতি যথেচ্ছ তাহাকে খাটাইবার অধিকার বজায় রাখিতে উদ্যত; অপরদিকে শ্রমিকও শ্রমদিবসকে উপযুক্ত সময়ের ভিতরে নির্দিষ্ট রাখার জন্য সচেষ্ট। এই বিরোধী অধিকারের দাবীর মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিপ্রয়োগ এবং জবরদস্তির। তাই পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনের ইতিহাসে আমরা দেখি, শ্রমদিবস যে কতঘণ্টায় নির্দিষ্ট হইবে তাহা ঠিক হয় সংগ্রামদ্বারা; এই সংগ্রামের দুই পক্ষ হইল, সমষ্টিগত পুঁজি অথবা পুঁজিপতি শ্রেণী এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিক অথবা শ্রমিকশ্রেণী।

পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ যদি বাড়ানো যায় অর্থাৎ বেশী সংখ্যক শ্রমিককে যদি নিযুক্ত করা হয়, তবে উদ্বৃত্ত-মূল্যও আদায় করা যায় অধিক পরিমাণে। অন্যভাবেও ইহার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। শোষণের মাত্রা অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বাড়াইতে পারিলেও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়িতে পারে। একজন শ্রমিকের ৬ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত-শ্রমসময়কে যদি ৯ ঘণ্টায় পরিণত করা যায়, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে বেশী পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করা হইল। তাহা হইলে দেখা গেল, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার অথবা পরিবর্তমান পুঁজিকে

বাড়াইলেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণের উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করিতে গিয়া যদি এমন দেখা যায় যে একটি কমিয়াছে, তাহা হইলে অপরটিকে বাড়াইলেই নির্দিষ্ট পরিমাণটি সংগৃহীত হইতে পারে। যে হারে হয়ত বা পরিবর্তমান পুঁজি কমিয়াছে ঠিক সেই হারে যদি শোষণের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পূর্বের উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণেই সংগৃহীত হইবে। পুঁজিপতি ১০০ জন শ্রমিকের জন্য প্রতিদিন ৩০০ শিলিং খরচ করিলে এবং ৫০% এই হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করিলে মোট ১৫০ শিলিং হইবে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ। এখন পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ যদি অর্ধেক করা হয়, অর্থাৎ ১০০ জন শ্রমিক না খাটাইলে সেই জায়গায় ৫০ জনকে খাটানো হয়, অথচ উদ্বৃত্ত-মূল্যের হারকে উঠাইয়া ৫০% হইতে ১০০% করা হয় অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রমের সময় ৩ ঘণ্টা হইতে ৬ ঘণ্টায় পরিণত করা যায় তাহা হইলেও উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ১৫০ শিলিংই থাকিবে। পূর্বে যেমন ১০০ জন শ্রমিক হইতে ৩ ঘণ্টা করিয়া ১০০ × ৩ = ৩০০ উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় সংগ্রহ করা হইত, এখনও তেমনি ৫০ জনের নিকট হইতে ৫০ × ৬ = ৩০০ উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ই সংগ্রহ করা হয়; সুতরাং দুই অবস্থাতেই একই পরিমাণের উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন হইল।

এই বিচার হইতে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইলাম, পরিবর্তমান পুঁজি কমাইয়া সমানুপাতেই উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বাড়াইলেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই সিদ্ধান্তটিকে অন্য প্রকারেও প্রকাশ করা যাইতে পারে; শ্রমিকের সংখ্যা কমাইয়া যে হারে ইহাদের সংখ্যা কমানো হইয়াছে সেই হারে যদি ইহাদের উদ্বৃত্ত শ্রম বাড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণের দিক হইতে ফলাফল একই থাকে। উদ্বৃত্ত মূল্যের হার কমাইয়া শ্রমিকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়াইলেও একই ফল দেখা যাইবে।

শ্রমিকের সংখ্যা যদি একটি বিশিষ্ট দেশে দশ লক্ষ ধরা যায়, তবে তাহাদের প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা করিয়া খাটাইয়া ১ কোটি ঘণ্টার কাজ আদায় করা যাইতে পারে। শ্রমদিবস যদি ১০ ঘণ্টায়ই নির্দিষ্ট রাখা যায়, ইহাকে আর বাড়ানোর সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে শুধুমাত্র শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়াই উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানো সম্ভব। সকলের পুঁজি মোট কত উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করিবে তাহা এই অবস্থায় নির্ভর করে শ্রমিকের মোট সংখ্যার উপরে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন হইতে আমরা দেখিলাম, যে কোনও পরিমাণের মুদ্রাকেই ইচ্ছামত পুঁজিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করিতে হইলে একটি নির্দিষ্ট অধমমান চাই। একেবারে সর্বনিম্ন পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ হইল একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য। এখন এই শ্রমশক্তির মূল্য উঠাইবার জন্য যদি ৮ ঘণ্টা শ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, আর ৪ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করিতে শ্রমিককে সেই পরিমাণ উৎপাদনের উপকরণাদিও দিতে হইবে। কিন্তু শ্রমিকের নিকট হইতে ৪ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত মূল্য উঠাইয়া সে শ্রমিকের গ্রাসাচ্ছাদনের অর্ধেক মাত্র নিজে লাভ করে। সুতরাং একজন শ্রমিক যে পরিমাণ মূল্য তাহার শ্রমশক্তির জন্য পায় সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উঠাইয়া সাধারণ একজন শ্রমিকের মত জীবন-যাপন করিতে হইলে ৮ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত-মূল্য উঠাইবার জন্য তাহাকে অন্তত ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে মাত্র নিজের জীবনধারণের জন্য রসদই সংগ্রহ হইতে পারে, পুঁজির যে আসল উদ্দেশ্য শুধু আত্ম-প্রসারণ তাহা কখনো সংঘটিত হইতে পারে না। শ্রমিক যে ভাবে জীবন-যাপন করে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিয়াও, মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের অর্ধাংশকে যদি পুঁজিতে পরিণত করিতে হয় তবে শ্রমিকের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণের

পরিমাণও আটগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। অবশ্য তাহার অধীনস্থ শ্রমিকের মত সে নিজেও কাজ করিতে পারে, কিন্তু তখন সে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মিশ্রণজাত একটা কিছু। তাহাকে বলা যাইতে পারে "ক্ষুদে-মনিব"। মধ্যযুগের গিল্ডগুলি "ক্ষুদে-মনিব" যাহাতে পুঁজিপতিতে পরিণত না হইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থাপন করিয়াছিল—'একজন মনিব নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিতে পারিবে না'। মধ্যযুগে পুঁজিপতির যাহা ছিল শ্রেষ্ঠ পুঁজির পরিমাণ, তাহা এখনকার যুগের সর্বনিম্ন পুঁজি হইবারও উপযুক্ত নয়। হেগেলের একটি কথা আছে, পরিমাণাত্মক বৃদ্ধি হইতে হইতে একটা বিশেষ জায়গায় আসিয়া যখন এই বৃদ্ধি উপনীত হয়, তখন সহসা পূর্ব হইতে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের গুণাত্মক প্রভেদ সৃষ্টি হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানের জগতেই যে এই কথাটি খাটে তাহা নয়, উৎপাদনের জগতেও তাহা খাটিয়া যায়। মুদ্রার পরিমাণে ১ হইতে বাড়িয়া ৯৯ এ যখন পৌঁছায়, তখনও তাহা মানুষের হাতে মাত্র ক্রয়শক্তি; কিন্তু যখনই আরো এক বাড়িয়া ১০০ হয়, তখন তাহা পরিণত হয় পুঁজিতে। পুঁজিতে মুদ্রা এখন শ্রমশক্তি ক্রয়ের ক্ষমতা অর্জন করিয়া পুঁজি হয়। পুঁজি হইতে হইলে মুদ্রার পরিমাণ কতখানি হইতে হইবে তাহা সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। পূর্বে হয়ত বা ৫০০ পাউণ্ড হইলেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্ভব হইত; এখন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি বাহির হওয়ার জন্য ৫০০০ পাউণ্ডের কমে উৎপাদন সম্ভব হয় না। বিভিন্ন উৎপাদনে বিভিন্ন পরিমাণের সর্বনিম্ন পুঁজি প্রয়োজন হয়। উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ভিতরে আমরা দেখিয়াছি, পুঁজি শ্রমের উপরে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। পুঁজিপতি সকল সময়ই সতর্ক ও সচেষ্ট থাকে। যেন শ্রমিক নিয়মমত এবং প্রাণপণ কাজ করে। তাহা ছাড়া, পুঁজি শ্রমিকের সহিত স্থাপন

করে শোষণের সম্পর্ক। পুঁজিতন্ত্র শুরু হইলে শ্রমিক অবশ্য পরবশতা স্বীকার করিল, কিন্তু তখনও উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বদলায় নাই, পূর্বের মতই রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল যে, সেই অবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ এবং ইহার বৃদ্ধি, উৎপাদনের যন্ত্রপাতির পরিবর্তনের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীনভাবে শ্রম দিবসটির ঘণ্টা বাড়াইয়াই করা হইত। সেকেলে রুটি তৈয়ারীর কারখানায় এবং নবাবিষ্কৃত যন্ত্রবহুল বয়ন-ফ্যাক্টরীতে উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহের উদ্যম সমানভাবেই রহিয়াছে।

একটি সরল শ্রমপ্রক্রিয়া হিসাবে যদি আমরা উৎপাদনকে দেখি, তাহা হইলে উৎপাদনের উপকরণাদি কখনো শ্রমিকের সহিত পুঁজির সম্পর্কে দাঁড়াইতে পারে না। ইহারা তাহার নিকট উৎপাদনেরই সহায়করূপে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়, যখন উৎপাদনকে আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহের উপায়রূপে দেখি। উৎপাদনের উপকরণাদিকে তখন আমরা দেখিয়া থাকি অপরের শ্রমকে নিংড়াইয়া বাহির করার উপায় হিসাবে। তখন আর শ্রমিক যন্ত্রকে চালনা করে না, যন্ত্রই শ্রমিককে নিয়ন্ত্রিত করে ও তাহার কর্তৃত্বাধীনে রাখে। যন্ত্রপাতিকে রাত্রিভাগে কর্মবিরত অবস্থায় থাকিতে হয় বলিয়া পুঁজিপতি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত ভাবিতে বাধ্য হয়। সে চায়, ২৪ ঘণ্টাই যদি যন্ত্র শ্রমিককে শুষিতে পারিত!

আমরা দেখিয়াছি, 'অবশ্য শ্রম-সময়' অপরিবর্তনীয়, কিন্তু শ্রম-দিবসটির পরিবর্তন সম্ভবপর। 'অবশ্য শ্রম-সময়ের' বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার। একটি শ্রমদিবসের বিভিন্ন অংশকে আমরা নীচের লেখ্যটিদ্বারা বুঝাইতে পারি।

a———b———c

সমস্ত রেখাটি ১২ ঘণ্টা শ্রমদিবসকে বুঝাইতেছে, a—b দশ ঘণ্টার 'আবশ্যক শ্রম-সময়' এবং b—c দুই ঘণ্টার 'উদ্বৃত্ত-শ্রম-সময়'। এখন প্রশ্ন

উঠিবে, a—c-কে আর না বাড়াইয়া অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ কি করিয়া সম্ভবপর। a—c দৈর্ঘ্যটি অপরিবর্তনীয় হইলে b—c কে আরো বাড়ানো সম্ভবপর। b-কে আমরা a-র দিকে সরাইয়া নিলেই b—c-কে আরো বড় করিয়া পাইতে পারি। ধরা যাউক b′—b+b—c-র অর্ধাংশ অথবা মাত্র ১ ঘণ্টার তুল্য।

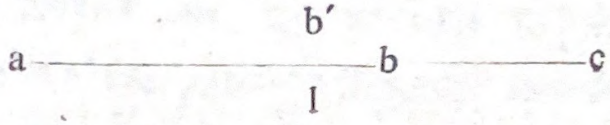

b-কে যদি আমরা a-র দিকে সরাইয়া b′ করি, b—c অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-শ্রমসময় হইল b′—c অথবা ৩ ঘণ্টা। উদ্বৃত্ত-শ্রমসময় দুই ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টা হইল বটে, কিন্তু মোট শ্রমদিবসটির ঘণ্টা পূর্বের মত ১২ ঘণ্টাই রহিল। কিন্তু এই ঘটনাটি সম্ভব হইল একমাত্র অবশ্য-শ্রম-সময়কে ১০ ঘণ্টা হইতে ৯ ঘণ্টায় পরিণত করিয়া। উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের বৃদ্ধি অর্থই হইল অবশ্য শ্রমসময়কে কমাইয়া দেওয়া। যে সময়টুকু শ্রমিক তাহার গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য খাটে, তাহারই একটি অংশকে সে পরিণত করে উদ্বৃত্ত-শ্রমসময়ে। শ্রমদিবসটির দৈর্ঘ্যের ভিতরে কোন পরিবর্তন ঘটিল না। পরিবর্তন ঘটিল অবশ্য শ্রমসময় এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমসময়ের পরিমাণের ভিতরে। প্রতি ঘণ্টায় যদি ৬ পেন্সের মূল্য উৎপাদন হয়, তাহা হইলে ১০ ঘণ্টা 'আবশ্যক শ্রম-সময়ের' উপযুক্ত মূল্য হইবে ৫ শিলিং। এই আবশ্যক শ্রমসময় এক ঘণ্টা কমিয়া যাওয়ায় যে মূল্য শ্রমিক এখন পাইবে তাহা ৪½ শিলিং মাত্র। এই ভাবে জবর-দস্তির সাহায্যে পুঁজিপতি যে উদ্বৃত্ত-শ্রমসময় বাড়াইয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিয়া লয় তাহা অবিসংবাদিত সত্য, কিন্তু আমরা বর্তমান বিচার ও আলোচনায় ধরিয়া লইয়াছি যে, সমান সমান মূল্যের ভিতরেই বিনিময় হইবে; এই দিক হইতেই আমরা উদ্বৃত্ত-সময় বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচনা করিব। তাহা হইলে আমরা ধরিয়া

নিলাম যেন শ্রমশক্তির মূল্যই বাজারে কমিয়াছে, জবরদস্তির সাহায্যে শ্রমিককে কম লইতে বাধ্য করা হয় নাই। শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাস হইয়াছে অর্থ, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শ্রমিকের যে সকল উপকরণ প্রয়োজন হইত তাহা এখন সে অল্প মূল্যেই অর্থাৎ ৫ শিলিং এ না কিনিয়া ৪½ শিলিংএ কিনিতে পারে। এই ৪½ শিলিংএর মূল্য প্রস্তুত করিতে তাহার ৯ ঘণ্টা সময় লাগে; সুতরাং দেখা গেল শ্রমিক যেমন তাহার শ্রম-শক্তির উচিত মূল্যটি পাইল, ঠিক তেমনি পুঁজিপতির লভ্যাংশও ফলস্বরূপ বাড়িতে পারিল।

মূল্যের এই হ্রাস সম্ভব হইতে পারে, জীবনধারণের উপকরণাদির মূল্য হ্রাস হইলে তবে। অপরদিকে, শ্রমিকের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস আবার সম্ভব হয় শ্রমের উৎপাদনীশক্তির বৃদ্ধি হইতে। শ্রমের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধি করিবার পূর্বে প্রয়োজন হইবে উৎপাদনের উপকরণাদির অর্থাৎ উৎপাদনরীতিরই আমূল রূপান্তর। একমাত্র এই উপায়েই শ্রমশক্তির মূল্য কমানো যাইতে পারে। তাহা হইলেই এই মূল্য উৎপাদনের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েরও প্রয়োজন হইবে। ফলে আবশ্যক শ্রম-সময় কমিয়া উদ্বৃত্ত-শ্রমসময় বাড়িবে।

শ্রমদিবসের ঘণ্টা বাড়াইয়া যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করা হয় তাহাকে বলা চলে "অনপেক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য"; শ্রমদিবসের ঘণ্টা না বাড়াইয়া "অবশ্য শ্রম-সময়" কমাইয়া যে উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানো হয় তাহাকে বলে আপেক্ষিক "উদ্বৃত্ত-মূল্য"।

উৎপাদনের ভিতরে দেখা যায়, একজন বিশিষ্ট উৎপাদন-কর্তা উৎপাদনের খরচ অপেক্ষাকৃত কমাইয়া অর্থাৎ শ্রমের উৎপাদনীশক্তি বাড়াইয়া আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য রাখিতে চেষ্টা করে। একঘণ্টার শ্রম যদি ৬ পেন্সের সমান হয়, তাহা হইলে ১২ ঘণ্টায় সৃষ্টি হইবে ৬ শিলিং। ধরা যাউক, এইবার ঘণ্টায় ১২টি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। প্রত্যেকটির ভিতরে

উৎপাদনের উপকরণ রহিয়াছে ৬ পেন্সের। এই অবস্থায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের মোট মূল্য ১ শিলিং। এখন একজন বিশিষ্ট উৎপাদক শ্রমের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করিয়া এমনভাবে উৎপাদনের আয়োজন করিল যেন ১২ ঘণ্টায় ১২টি দ্রব্যের জায়গায় ২৪টি দ্রব্য উৎপাদিত হয়। ধরা যাউক, যেন উৎপাদনের উপকরণাদির মূল্যের কোনরকম তারতম্য হয় নাই; তাহা হইলে পুরাতন মূল্য প্রত্যেকটি দ্রব্যের ভিতরে পূর্বের মতই থাকিবে, নূতন মূল্য প্রত্যেকটি দ্রব্যে সংযোজন হইবে পূর্বের চাইতে অর্ধেক। এই অবস্থায়, এক একটি দ্রব্যের মোট মূল্য হইল ৯ পেন্স। এই দ্রব্যের সমাজ নির্ধারিত মূল্য ১ শিলিং, কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য মাত্র ৯ পেন্স। কিন্তু প্রকৃত মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূল্য নয়, সমাজ নির্ধারিত মূল্য। সুতরাং এই সমাজ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিলে পুঁজিপতির তিন পেন্স অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ হইল। সে যদি ১০ পেন্সেও বিক্রয় করে, তবুও তাহার ১ পেন্স অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ হইবে। প্রত্যেক উৎপাদন কর্তারই উদ্দেশ্য থাকে উৎপাদনশক্তি অপরের অপেক্ষা বাড়াইয়া পণ্যের মূল্য কমাইয়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা।

যাহা হউক, ১০ পেন্স হারে ২৪টি পণ্য পুঁজিপতি বিক্রয় করিবে মোট ২০ শিলিং-এ। এই ২০ শিলিংএর ভিতরে ১২ শিলিং হইল উৎপাদনের উপকরণাদির মূল্য; এই অংশটুকু বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৮ শিলিং; এই আট শিলিং হইল নূতন উৎপাদিত মূল্যের সমতুল্য। ৮ শিলিং হইতে আবার ১০ ঘণ্টা আবশ্যক শ্রমসময়ের ৫ শিলিং বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩ শিলিং। পূর্বে সকলের পক্ষে আবশ্যক শ্রমসময় ৫ শিলিং হইলে উদ্বৃত্ত শ্রমসময় হইয়াছে ১ শিলিং; অথচ এই বিশেষ শ্রমকর্তার বেলায় উদ্বৃত্ত শ্রমসময় হইয়াছে ৩ শিলিং; ১২ ঘণ্টাকেও আমরা এই অনুপাতে ভাগ করতে পারি; সকলের

পক্ষে আবশ্যক শ্রমসময় ১০ ঘণ্টা এবং উদ্বৃত্ত শ্রমসময় ২ ঘণ্টা ; কিন্তু আমাদের বিশেষ উৎপাদনকর্তাটির বেলায় আবশ্যক শ্রমসময় হইয়াছে ৭½ ঘণ্টা আর উদ্বৃত্ত শ্রমসময় ৪½ ঘণ্টা। অর্থাৎ আমাদের বিশেষ পুঁজিপতিটির মুনাফা বেশী হইলেও অপর সকলে শ্রমিককে যাহা দেয় তাহাই সেও দিবে। অথচ এই ৫ শিলিং সে তাহার শ্রমিককে দিয়া মাত্র ১০ ঘণ্টার জায়গায় ৭½ ঘণ্টাই প্রস্তুত করায়। তাহা হইলে দেখা গেল, এই উপায়ে "আবশ্যক-শ্রমসময়" কমাইয়া দেওয়া সম্ভবপর যতখানি কমানো হইল ততখানি এই বিশিষ্ট পুঁজিপতি আত্মসাৎ করিল উদ্বৃত্ত-শ্রম-সময়রূপে। কিন্তু এই ভাগ্যবান পুঁজিপতি বেশীদিন এই উদ্বৃত্ত মূল্যের অতিরিক্ত অংশটি ভোগ করিতে পারিবে না। অন্যান্য সকল পুঁজিপতিই যখন এই নূতন উৎপাদনপ্রণালী গ্রহণ করিবে তখন উদ্বৃত্ত মূল্যের অতিরিক্ত অংশটি কাহারো ভাগ্যেই জুটিবে না।

সমবায়

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন শুরু হয় যখন কোনও পুঁজিপতি একসঙ্গে বহু শ্রমিককে উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োজিত করে। ফলে শ্রমপ্রক্রিয়া বিপুল আকারে অনুষ্ঠিত হয়, উৎপাদিত দ্রব্যের সংখ্যাও হয় বহুল। একজন পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে ও আজ্ঞাধীনে বহু শ্রমিক এইভাবের উৎপাদনে রতী হইবে, তাহাই ইতিহাসের দিক হইতে পুঁজিতন্ত্রের শুরু। পুঁজিতন্ত্রের গোড়ায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতির চেহারা বদলায়

নাই, পূর্বযুগেরই মত তাহা ছিল; সুতরাং পূর্বযুগের সহিত পুঁজিতন্ত্রের এই দিক হইতে বড় একটা প্রভেদ তখনো দেখা দেয় নাই। একমাত্র প্রভেদ দেখা দিল, একজন পুঁজিপতি বহু শ্রমিককে সমবেতভাবে খাটাইয়া নেয়। এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে, মধ্যযুগের হস্তশিল্প মনিবের ক্ষুদ্র কারখানাটি একটু বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। উৎপাদনের হাতিয়ার প্রভৃতি হস্তশিল্পের স্তরেই তখনো রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল, পূর্বযুগের উৎপাদনের সাথে যে প্রভেদ সৃষ্টি হইল, পুঁজিতন্ত্রের গোড়ার দিকটায় তাহা মাত্র সংখ্যাত্মক, গুণগত মোটেই নয়। শ্রমিক হিসাবে রাম এবং যদু নিশ্চয়ই সমতুল্য হইতে পারে না; একটু বিভিন্নতা তাহাদের থাকেই। ১০ জন লোক যদি পৃথক পৃথকভাবে উৎপাদন করে, সকলের উৎপন্নের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। কিন্তু ১০জনকে সমবেতভাবে উৎপাদন করিতে দিলে, একজনের ন্যূনতা অপরজনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা পরিপূরিত হয়। প্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্ক একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিজনের পৃথক পৃথক উৎপাদনের তারতম্য দেখা যায়, কিন্তু পাঁচজনের একটি দলকে যদি উৎপাদন করিতে দেওয়া হয় এবং অপর পাঁচজনের আর একটি দলও যদি উৎপাদন করে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এই দুই দলের উৎপাদনের পরিমাণের ভিতরে বড় একটা পার্থক্য ঘটে নাই। পুঁজিপতি তাহার অধীনস্থ সমগ্র শ্রমিক দলটিকে একজন ব্যক্তি হিসাবেই দেখে। প্রত্যেকের শ্রমের ঘণ্টা এখানে গড়পড়তা হিসাবে নিরূপিত হয়। একজন হয়ত বা বেশী ঘণ্টা কাজ করিতে পারে, অপরজন কম করিতে পারে; কিন্তু ১২ জন শ্রমিক প্রতিদিন ১৪৪ ঘণ্টা কাজ করিলে প্রতিজনের গড়পড়তা হিসাবে শ্রমের ঘণ্টা হয় বার। কিন্তু এই

বারজনকে যদি ছয়টি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া এক একজনকে পুঁজিপতির অধীনে কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক দলের সহিত প্রত্যেক দলের মোট উৎপাদনে বিভিন্নতা প্রকাশ হইবেই। একদলের মোট উৎপাদন হয়ত বা এত কম হইয়াছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি দ্রব্যের জন্য খরচ এত বেশী পড়িয়াছে যে বাজারে এই দলের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ই হইবে না। পুঁজিপতি হিসাবে উৎপাদনের কর্তাকে দেখিতে হইবে, তাহার অধীনস্থ শ্রমিকেরা যাহা উৎপাদন করিবে তাহা যেন অন্য পুঁজিপতির অধীনস্থ শ্রমিকেরা যে পরিমাণ উৎপাদন করে তাহার সমান হয়। তাহা হইলেই প্রত্যেক শ্রমিককে অন্তত গড়পড়তা শ্রম দিতে হইবে; ইহা সম্ভব ব্যক্তিশ্রমিক যখন সমষ্টি শ্রমিকের অঙ্গীভূত হইয়া কাজ করে।

সমবেত শ্রমিকদের দ্বারা সমষ্টিগত উৎপাদনে শ্রম প্রক্রিয়ার আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলির ভিতরেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। গৃহ সরঞ্জাম এবং উৎপাদনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এখন একসঙ্গেই ব্যবহৃত হইবে। দশজন শ্রমিকের শ্রমের জন্য উপরোল্লিখিত যে সরঞ্জামের আবশ্যক ১৫ জনের কাজের জন্যও প্রায় তাহাতেই চলিয়া যায়। এই সরঞ্জামগুলির ব্যবহার-মূল্য সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইল বলিয়া যে তাহাদের বিনিময় মূল্য বাড়িল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। যে ঘরে ২০ জন বয়নকারী কাজ করে তাহা একজন বয়নকারীর কাজ করিবার মত ঘরের চেয়ে যে বড় হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুই দুই জন করিয়া বয়নকারীর জন্য ১০টি ঘর পৃথক পৃথক তৈয়ারী করিতে যে খরচ লাগিবে ২০ জনের জন্য একটি বড় ঘর তৈয়ারী করিতে তাহার চেয়ে কম খরচের প্রয়োজন। এই কথাটি

উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের বেলায়ও খাটে। বেশী লোক একত্র হইয়া খাটিলে বেশী উপকরণাদি প্রয়োজন হইবে সত্য, কিন্তু পৃথক পৃথক খাটিলে যে খরচ হইত তাহার সমান অনুপাতে তাহা বাড়িতে পারে না। এই প্রকারের কম খরচের একমাত্র কারণ, বেশীসংখ্যক লোক সমষ্টিগত ভাবে উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হয়।

যখন বেশী সংখ্যক শ্রমিক একই শ্রমপ্রক্রিয়া অথবা পরস্পর সম্বন্ধে শ্রমপ্রক্রিয়ার ভিতরে পাশাপাশি হইয়া কাজ করে, তখন আমরা বলি যে শ্রমিকেরা পরস্পর সহযোগিতার সমবায় শক্তিতে কাজ করিতেছে। একটি পদাতিক সৈন্যদলের সংহত শক্তি যেমন পৃথক পৃথক পদাতিকগণের ব্যক্তিগত শক্তির যোগফল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তেমনি বহু শ্রমিক সমবেতভাবে যে যান্ত্রিক শক্তিকে পরিচালনা করে তাহাও পৃথক পৃথক শ্রমিকের শক্তি প্রয়োগের সমষ্টি হইতে ভিন্ন। সমবেত শ্রম হইতে যে সকল ফলাফল প্রস্তুত হয় তাহা কখনো পৃথক পৃথক শ্রমিকের শ্রম দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। এই জায়গায় আমরা দেখিলাম, সমবায়ের সাহায্যে ব্যক্তির উৎপাদন শক্তিই যে শুধু বৃদ্ধি হইল তাহা নয়, একটি নূতন শক্তির উদ্ভব হইল—ইহা শ্রমিকগণের সমষ্টিগত শক্তি।

একটি দ্রব্য উৎপাদনে দশজনের কাজের প্রয়োজন হইতে পারে। একজন শ্রমিককে যদি এই দশরকমের কাজই করিতে হয় তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় দ্রব্য উৎপাদন খুবই শ্রম-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। তাহা না করিয়া ১০ জনকে যদি ১০ রকমের কাজে নিযুক্ত করা যায়, এবং প্রত্যেকেই একটি করিয়া কাজই বারবার করে তাহা হইলে বহুসংখ্যক দ্রব্য অল্প সময়ে উৎপাদন হওয়া সম্ভব হইবে। কতকগুলি উৎপাদনের ভিতরে দেখা যায়, ঐ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিতরে এমন একটা সময় আসে যখন নাকি সমবেত শ্রম একান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠে। জমি হইতে শস্য কাটিতে হইবে একটি বিশেষ ঋতুর নির্দিষ্ট

সময়ের ভিতরে। তাহা হইলে একাধিক লোককে এক সময়ে নিয়োজিত করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

সমবেত শক্তির শ্রম হইতে যে অধিক উৎপাদন হয় তাহার বহু কারণ রহিয়াছে। একসাথে কাজ করিলে উৎপাদনের উপকরণাদি অপেক্ষাকৃত কম লাগিতে পারে, সময়-সংকোচন হইতে পারে, একটি শ্রম-প্রক্রিয়ার ভিতরে বিবিধ প্রকারে কাজ একই সময়ে হয় বলিয়া অল্প সময়ে অধিকসংখ্যক দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। এই যে বর্ধিত উৎপাদন শক্তি ইহার মূল শ্রমিক সমবায়। সমবায় সমাজ-শক্তিকে বিকশিত করে।

যতক্ষণ না কেহ শ্রমিকদের একত্রিত করে ততক্ষণ তাহারা সমবেত-ভাবে খাটিবার সুযোগ পায় না। কোন একজন পুঁজিপতিকে বহু শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে একত্র কিনিতে হইবে। কতখানি যে কিনিতে পারিবে, তাহা নির্ভর করে তাহার পুঁজির পরিমাণের উপর। শুধু শ্রমশক্তি ক্রয় করিবার মত পুঁজি থাকিলেই চলিবে না, শ্রমিককে উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হইবে। সুতরাং শ্রমিক সমবায়ের জন্য পুঁজিপতির হাতে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। এইগুলি যে পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হইবে সেই অনুপাতেই শ্রমিক-সমবায়ও সংঘটিত হইতে পারে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, পুঁজির সর্বনিম্ন পরিমাণ অন্তত এতখানি হওয়া চাই যেন পুঁজিপতিকে শ্রম করিতে না হয়; এখন আবার আমাদের দেখিতে হইতেছে, পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র শ্রম-প্রক্রিয়া যাহাতে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে তাহার জন্য একটি নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন পুঁজির পরিমাণ চাই।

বৃহদায়তনে যুক্ত-শ্রম পরিচালনের জন্য এবং ব্যক্তিগত শ্রমিকদের কাজকর্মকে সুসংবদ্ধ আকারে সংগ্রথিত করার জন্য পরিচালকের প্রয়োজন। একজন বেহালাবাদক যখন বেহালা বাজায়, তখন সে নিজেই হয় নিজের পরিচালক; কিন্তু অর্কেস্ট্রার বেলায় তাহা চলিতে

পারে না। একজন কাউকে পরিচালনার ভার নিতেই হয়। পুঁজির একটি বিশেষ কাজ হইয়া দাঁড়ায় শ্রমিকের কাজ পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ। এই পরিচালনার পশ্চাতে পুঁজিপতির উদ্দেশ্য রহিয়াছে অধিক হইতে অধিকতর উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ। সর্বাধিক মাত্রায় শোষণদ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। সমবায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে, পুঁজির প্রাধন্যকে প্রতিরোধের জন্য শ্রমিকেরাও সচেষ্ট হয়, আবার পুঁজিপতিরাও প্রতিরোধকে ঘায়েল করিবার জন্য উল্টা চাপ দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। শ্রম-প্রক্রিয়া সামাজিক আকার লইয়া নির্বাহিত হয় বলিয়াই যে পুঁজির কর্তৃত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা নয়, সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়ার ভিতরেই তাহা নিহিত রহিয়াছে—এই কর্তৃত্ব পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরোধের ভিতরেই বর্তমান।

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, পুঁজিপতি কি করিয়া ধীরে ধীরে নিজে শ্রম হইতে অব্যাহতি পাইয়া শুধুই অপরকে খাটানোর ভার লইয়াছে। এইবার আমরা দেখিব, শ্রমিকের কাজ পরিচালন ও নিয়ন্ত্রন, ইহাও সে নিজে আর সম্পাদন করে না। বেতনভূক লোক রাখিয়া তাহাদের দ্বারা এই কার্যটি সম্পাদন করান হয়।

এইখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, উৎপাদনের কর্তা ও পরিচালক বলিয়াই পুঁজিপতি পুঁজিপতি নয়; পুঁজির মালিক বলিয়াই সে উৎপাদনের একচ্ছত্র অধিকার ও কর্তৃত্ব পাইয়াছে। মধ্যযুগে যেমন সেনাধ্যক্ষতা ও বিচার-আচারের কর্তৃত্ব ছিল ভূম্যাধিকারী-অভিজাত সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ কার্য, তেমনি এযুগে উৎপাদনের নেতৃত্ব গ্রহণ করাও হইয়া দাঁড়াইয়াছে পুঁজিপতির একটি বিশেষ ধর্ম।

শ্রম-বিভাগ ও মেন্যুফেকচার

পুঁজিতন্ত্রের গোড়ার দিকটাকে আমরা বলি মেনুফেক্চার। তখনও যন্ত্রপাতি কলকব্জার আকার ধারণ করে নাই। পুঁজিপতি শ্রম-শক্তি ক্রয় করিয়া ইহাকে কাজে লাগায় বটে, কিন্তু শ্রমিকেরা কাজ করে হস্তশিল্পীদের মতন পূর্বেকার হাতিয়ার দ্বারাই। সুতরাং উৎপাদনের রীতি কিছুই বদলায় নাই। শ্রম-বিভাগের সূত্রে পরিচালিত সমবায় রীতি মেনুফেক্চারের ভিতরেই বিকশিত হয়। মেনুফেক্চার যুগটি ১৬ শতক হইতে ৮ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

মেনুফেক্চারের উদ্ভব হয় দুই প্রকারে।

১। একজন পুঁজিপতি তাহার কারখানায় স্বাধীন হস্তশিল্পীদের সমবেত করে। একটি জিনিস সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহাদের প্রত্যেকের হাত ঘুরিয়া ইহাকে যাইতে হইবে। একটি গাড়ী তৈয়ারী করিতে হইলে পূর্বে একজন একজন করিয়া বহু স্বাধীন হস্তশিল্পীর হাত ঘুরিয়া যাইতে হইত। মেনুফেক্চারের যুগে পুঁজিপতি এই হস্তশিল্পীদের যার-যার ঘরে বসিয়া আপন আপন কাজ করিতে না দিয়া তাহাদের সমবেত করিল তাহার নিজের কারখানায়। স্বাধীনভাবে যখন কাজ করিত তখন শুধু গাড়ীর কাজই এইসব স্বাধীন হস্তশিল্পীরা করিত না; দর্জিকে এখন পুঁজিপতির গাড়ীর কারখানায় আসিয়া গাড়ীসংক্রান্ত সিলাইয়ের কাজই করিতে হয়; কিন্তু স্বাধীনভাবে সে যখন কাজ করিত তখন অন্যান্য প্রকারের সিলাই-সংক্রান্ত কাজও সে করিত। এইভাবে তাহার কাজের পরিসর সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইল। ইহা হইতেই ধীরে ধীরে মেনুফেক্চারের শ্রম-বিভাগ গড়িয়া উঠিল।

২। ইহার ঠিক উল্টারকমেও মেনুফেক্চার গড়িয়া উঠে। পুঁজিপতি বাজারে শ্রম-শক্তি ক্রয় করিয়া শ্রমিককে আপন কারখানায় নিয়োগ

করে। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকেই একই কাজ করে। সূচ তৈয়ারী করিতে গিয়া এক একজন যে সূচের এক একটি বিভিন্ন অংশের কাজ করিবে তাহা নয়, প্রত্যেকে ইহারা সূচ তৈয়ারীর সকল কাজগুলিই করিবে। কিন্তু অবস্থার চাপে এক জায়গায় একত্রীকৃত শ্রমিক শক্তির এই রকম প্রয়োগ ও ব্যবহার না বদলাইয়া পারে না। বেশী পরিমাণ দ্রব্য নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে উৎপাদনের প্রয়োজন হইয়া উঠে। তখনই শ্রম বিভাগ অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। একটি দ্রব্য তখন একজনের শ্রম-প্রসূত না হইয়া সমষ্টির শ্রমদ্বারা উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন শ্রমিক সমগ্র দ্রব্যটি প্রস্তুত না করিয়া ইহার বিভিন্ন অংশ নির্মাণে ব্রতী হয়। ধীরে ধীরে এই শ্রম-বিভাগ হইয়া দাঁড়ায় একটি অতি দৃঢ় সমাজ-ব্যবস্থা।

তাহা হইলে একজায়গায় দেখা গেল, মেনুফেকচার বিভিন্ন স্বাধীন হস্তশিল্পীদের একত্র করিয়া তাহাদের পরস্পর নির্ভরশীল করিয়া তুলে; এবং অপরটিতে দেখা যায়, মেনুফেকচার উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ভিতরে একটি বিশেষ সময়ে শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করিতে বাধ্য হয়। গোড়ায় পুঁজিপতি কি করে তাহা যেমনই হউক না কেন, ইহাদের শেষ রূপটি একই—উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে নিয়োজিত; সুতরাং তাহারা পরস্পর নির্ভরশীল।

শ্রম-বিভাগ খুব সরল অথবা খুব সূক্ষ্ম যেমনই হউক না কেন, নিম্নোক্ত সত্যটি আমরা কখনো অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করিতে পারি না। উৎপাদন তখনও হস্তশিল্পের পর্যায়েই থাকিয়া যায়। সুতরাং উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও হাতের নিপুণতার উপরে। এই রকমের উৎপাদনে হাতের কাজেরই স্থান খুব প্রবল বলিয়া, এক একজন শ্রমিক এক একটি নির্দিষ্ট কাজে এমনভাবে আটকা পড়িয়া যায় যে অন্য প্রকারের কোনও কাজের আর তাহার উপযুক্ততা থাকে না।

পুঁজিপতির কারখানায় মেনুফেকচার যে ভাবে শ্রম-বিভাগের প্রবর্তন করে তাহাতে একজন শ্রমিককে আজীবন দ্রব্যের মাত্র একটি অংশের উৎপাদনেই নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাতে শ্রমিক তাহার আপন কাজে অনেক বেশী দক্ষতা অর্জন করে। সমাজে শ্রম-বিভাগ খুব স্বাভাবিক ভাবেই রহিয়াছে—কেহ বা বস্ত্র বয়ন করে, কেহ বা লোহার কাজ করে, কেহ কৃষিকার্য করে। মেনুফেকচার এই স্বাভাবিক শ্রম-বিভাগকেই এত বেশী সূক্ষ্ম ও জটিল করিয়া তুলে যে কোনও একজনকে একটি দ্রব্যের সমগ্রটুকু'ত উৎপাদন করিতে হয়ই না, একটির বেশী দুইটি অংশও তৈয়ার করিবার প্রয়োজন ঘটে না। এই ভাবের অংশীকৃত কাজই হয় একজন শ্রমিকের সারাজীবনের ব্যবসায়। একজন শ্রমিককে একটি কাজ করিয়া অন্য একটি কাজ করিতে হইলে বারবার তাহাকে স্থান পরিবর্তন করিতে হয়, হাতিয়ার বদলাইতে হয়—ইহাতে সময় নষ্ট হয় খুবই বেশী। কিন্তু একজনকে যদি একটি কাজই এক জায়গায় বসিয়া করিতে হয়, সময়-সংক্ষেপ'ত হইবেই, তাহা ছাড়া কার্যদক্ষতা ও কাজের প্রতি নিবিষ্টতাও দেখা দেয় অনেক বেশী। ফলে, উৎপাদনের মাত্রা এই উপায়ে অনেকখানি বাড়িয়া যায়। অপরদিকে, বারবার একই কাজ করার ভিতরে বিরক্তি-উৎপাদন ও একঘেয়ে ভাবের সৃষ্টি হয় বেশী; এককাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাইবার সুযোগ থাকিলে আত্ম-বিনোদনের সম্ভাবনা থাকে।

উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধি শ্রমিকের ক্ষমতা হইতেই শুধু হয় না, হাতিয়ার-গুলিও উপযুক্ত হওয়া চাই। একই হাতিয়ার হয়ত বা একই শ্রম-প্রক্রিয়ায় পাঁচরকম কাজে লাগে। কিন্তু শ্রম-বিভাগের সাথে সাথে হাতিয়ারগুলিকে সকলরকমের কাজে নিযুক্ত না করিয়া, একটি বিশিষ্ট কাজে ব্যাপৃত করাই প্রয়োজন হইয়া উঠে। মেনুফেকচারের যুগে দ্রব্যউৎপাদনের যাবতীয় বিভাগের উপযোগী হাতিয়ার তৈয়ারী হইয়া

ইহাদের সংখ্যা ও রকম বৃদ্ধি পায়; এই অবস্থাটি হইতেই ধীরে কলকব্জার সৃষ্টি হইবে; কলকব্জার মেনুফেকচার-যুগের সরল হাতিয়ার প্রভৃতিরই সমবায় মাত্র।

মেনুফেকচারের মূলকথা হইল, খণ্ড খণ্ড কাজের জন্য পৃথক পৃথক শ্রমিক নিয়োগ এবং তাহাদের কার্যোপযোগী পৃথক পৃথক হাতিয়ারের ব্যবস্থা।

মেনুফেকচারের দুইটি মৌলিক রূপ আছে—(১) পৃথগ্বিধ (Heterogeneous) মেনুফেকচার (২) ক্রমানুসারী (Serial) মেনুফেকচার। এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে, যাহার বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে উৎপাদিত হয়; ইহাদের একত্র করিয়া তবে দ্রব্যের সমগ্র চেহারাটি আমরা পাই। এইভাবের দ্রব্য-উৎপাদন সম্পন্ন হয় যান্ত্রিক উপায়ে। নুরেমবুর্গের হস্তশিল্পীদ্বারা তৈয়ারী ঘড়ি পরবর্তী মেনুফেকচার যুগে আর একজনের উৎপাদিত দ্রব্য রহিল না; ঘড়ি তখন বহু লোকের বিভিন্ন কার্যের ফলস্বরূপ তৈয়ারী হইতে লাগিল। এক একজন শ্রমিক এক একটি অংশ তৈয়ারী করিলে পর, সর্বশেষের শ্রমিক ইহাদের একত্রীভূত করিয়া ঘড়ি তৈয়ারী করে। এই বিভিন্ন অংশগুলিকে জোড়া দেওয়ার পূর্বে তাহাদের ভিতরে কোন সম্বন্ধ ছিল না—ইহারা সকলই পৃথক পৃথক তৈয়ারী হইয়াছে। ক্রমানুসারী মেনুফেকচার আবার অন্যরকম, ইহা মেনুফেকচারের বিকশিত রূপ। একটি দ্রব্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহাকে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া তবে শেষ রূপটি লইতে হয়। কাঁচামাল হইতে শুরু করিয়া দ্রব্য-রূপটি পর্যন্ত একটি পরম্পরাগত সম্পর্ক দ্বারা স্তরগুলি সংগ্রথিত। একজন শ্রমিক হইতে একটি রূপ লইয়া কাঁচামাল অন্য শ্রমিক-হস্তে অন্য রূপ নেয়, এইভাবে হয়ত বা পাঁচটি স্তরের ভিতর দিয়া গেলে তবে তাহার সম্পূর্ণ এবং শেষ রূপটি লাভ হয়। সমষ্টিগত শ্রমিক বহু-হস্ত-সমন্বিত

এবং বহু হাতিয়ার-যুক্ত বলিয়াই এই প্রকারের উৎপাদনে এক সময়েও এক সাথে বহুপ্রকারে কাজ সম্পন্ন হইতেছে দেখা যায়। ক্রমানুসারী মেনুফেকচারে একজনের বিশেষ প্রকারের শ্রম যেখানে শেষ হয়, সেখান হইতে শুরু হয় অপর একজনের অন্য প্রকারের শ্রম।

একজনার কাজ নির্ভর করে অপর একজনার কাজের উপর। প্রথম শ্রমিক যে কাজটি করিয়াছিল তাহা যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে দ্বিতীয় স্তরে সম্পন্ন করিতে হয় তাহা হইলে ২ জন শ্রমিকের হয়ত বা প্রয়োজন হইবে। শ্রম-বিভাগ যত সুক্ষ্ম হইবে, ততই বিশেষ করিয়া প্রয়োজন হইবে বিভিন্ন স্তরগুলির ভিতরে উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগ। শ্রমবিভাগ-প্রক্রিয়া দ্বারা যত বেশী কর্মের গুণগত প্রভেদ স্বষ্ট হইবে ততই বিভিন্ন স্তরগুলির ভিতরে সংখ্যার অনুপাত স্থির করা দরকার হইবে।

মেনুফেকচার যুগে দ্রব্যবিশেষের উৎপাদনে দেখা যায়, তাহার বিশেষ একটি স্তরের কাজ এত শক্ত যে তাহাতে সাধারণ হাতিয়ার চলে না, সেখানে প্রয়োজন হয় কলের। মেনুফেকচারের ভিতরে হাতের কাজই প্রবল হইলেও সেই যুগে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের উদ্ভব দেখিতে পাই। কম্পাস, টাইপ-প্রিন্টিং' অটোমেটিক ক্লক প্রভৃতির আবিষ্কার মেনুফেকচারের যুগেই হইয়াছে। ইহাদের ব্যবহার তখনও সুনিয়ন্ত্রিত রীতিতে সার্বত্রিক হইয়া উঠে নাই।

মেনুফেকচারে যে শ্রম-বিভাগ হইল তাহার ফলস্বরূপ দেখা গেল যে শ্রমিকেরা মাত্র একটি বিশেষরকমের কাজই করে, দ্রব্যের একটি অংশ মাত্র প্রস্তুত করে, সমগ্র দ্রব্যটির উৎপাদনে ব্যক্তিগত শ্রমিকের কোন হাত নাই। সমগ্র দ্রব্যটি প্রস্তুত করিবার অধিকার সমষ্টিগত শ্রমিকের। সুতরাং শ্রমিকের কর্মদক্ষতা সীমাবদ্ধ হয় একটি ক্ষুদ্র জিনিসের ভিতরে। তাই তাহার কর্মদক্ষতাকে সম্পূর্ণরূপে স্ফুরিত ও বিকশিত করার সুযোগ

সে হারায়। এইভাবে শ্রমিকের ব্যক্তিত্ব খর্বিত হয়। শুধু তাহাই নয়, শ্রম-বিভাগ হইলেও শ্রমেরও রকমভেদ আছে ; জটিল এবং সরল, উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরের শ্রম রহিয়াছে। এই ভেদ অনুসারে, বেশী বেতনের ও কম বেতনের শ্রমিকের দল দেখা দিল।

উৎপাদনের ভিতরে যে শ্রম-বিভাগ আমরা দেখিলাম, তাহার মূলে রহিয়াছে সমাজের ভিতরে শ্রম-বিভাগ। প্রথমত গোষ্ঠীর ভিতরে তারপর পরিবারে পুরুষ মেয়ে বিভেদ এবং বয়সের তারতম্যের উপরে শ্রমবিভাগ আত্ম-প্রকাশ করে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম বিনিময় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হয় নাই, সর্বপ্রথম ইহা সংঘটিত হইয়াছিল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ; কেননা সভ্যতার প্রথমযুগে ব্যক্তি গোষ্ঠীদ্বারা আচ্ছন্ন থাকিত। বিভিন্ন গোষ্ঠী তাহাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতরে বিভিন্ন রকমের উৎপাদনে যাইত তাহাদের উৎপাদনের এবং জীবনধারণের উপকরণ তৈয়ারীর জন্য। তাই তাহাদের উৎপাদনের প্রণালী, জীবনের রীতি এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিভিন্ন রকমের। এই বিভেদটুকু আছে বলিয়াই বিনিময় অবশ্যম্ভাবী। বিনিময় কখনো শ্রম-বিভাগের কারণ নয় ; প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হইতে শ্রম-বিভাগ স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে উৎপাদনের গোড়ার কথা, দ্রব্যের পণ্যে পরিণতি এবং বাজারে ইহাদের চলাচল। সুতরাং মেনুফেকচারে শ্রম-বিভাগের জন্য প্রয়োজন সমাজে শ্রমবিভাগের বিশেষ মাত্রায় বিকাশ। আবার উল্টা দেখা যায়, মেনুফেকচারে শ্রম-বিভাগ সৃষ্টি হয়। একটি উৎপাদনের জন্য তিন প্রকার জিনিসই হয়ত বা এক জায়গায় উৎপাদিত হয়। কিন্তু বেশী উৎপন্নের জন্য শ্রম-বিভাগ যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল, ততই দুই প্রকার জিনিসের উৎপাদন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদিত হইতে শুরু করিল ; উহাতে সমাজে শ্রম-বিভাগ পূর্ব হইতে বেশী বাড়িল।

উৎপাদনে শ্রম-বিভাগ এবং সমাজে শ্রম-বিভাগ এই দুইয়ের ভিতরে কয়েকটি মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। কারখানায় শ্রম-বিভাগ হইতে হইলে একজন পুঁজিপতির হাতে উৎপাদনের উপকরণাদি কেন্দ্রীভূত হওয়া চাই, কিন্তু সমাজে শ্রম-বিভাগ হইতে হইলে বহু স্বাধীন উৎপাদন-কর্তার হাতে পুঁজিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকা চাই। কারখানায় দেখা যায়, তাহার একটি বিভাগে যে পরিমাণ লোক নিয়োগ করা হইল, ঠিক সেই অনুপাতে অন্যান্য বিভাগেও লোক নিয়োগ করা চাইই। কিন্তু কারখানার বাহিরে সমাজে দেখা যায় যে বিভিন্ন উৎপাদনে লোক নিয়োগ করা হয় নিতান্তই বিশৃঙ্খল ভাবে; একটি উৎপাদনে হয়ত বা একটু বেশী মুনাফা পাওয়া যাইতেছে, অমনি অন্যান্য উৎপাদন হইতে লোক ও পুঁজি উঠাইয়া আনিয়া তাহাতে নিযুক্ত করা হইবে। অবশ্য বিভিন্ন উৎপাদনে যে পরিমাণ পুঁজি খাটানো দরকার তাহার ভিতরে একটা সামঞ্জস্য শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু এই সামঞ্জস্য আসে বারবার অসামঞ্জস্য ও সঙ্কটের ভিতর দিয়া।

বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের একটি অদ্ভুত মনোভাব এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সমাজের ক্ষেত্রে তাহারা চায় প্রতিযোগিতা; এই প্রতিযোগিতা খর্ব করিবার জন্য যদি সমাজ কখনো হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে পুঁজিপতিরা খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়ায়। সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের পরিচালনা এবং বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন উৎপাদনে লোক নিয়োগ কখনো তাহাদের মনঃপূত হইতে পারে না। অথচ দেখা যায়, নিজেদের কারখানার ভিতরে তাহারাই আবার এই নীতিরই অনুসরণ করে। সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর উদ্ভাবন করিয়া, শ্রমিকের সকল রকমের অধিকারে বাধা জন্মাইয়া পুঁজিপতিরা উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনের উপরে সামাজিক কর্তৃত্ব তাহারা উপেক্ষা করে, কিন্তু কারখানায় তাহাদের নিজেদের

কর্তৃত্ব থাকা চাই সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সমাজে উৎপাদনের ভিতরে প্রতিযোগিতামূলক অরাজকতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, কারখানায় শ্রমিকের উপরে পুঁজিপতির স্বেচ্ছাচারমূলক কর্তৃত্ব ততই বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু পুরাতন উৎপাদনপ্রণালীগুলির ভিতর আমরা দেখিতে পাই, যে তখন উৎপাদনের উপর সমাজের কর্তৃত্ব ছিল বেশী; বেশী ছিল বলিয়াই শ্রম-বিভাগ খুব সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। জাত (caste) এবং গিল্ডের উপরে সমাজের খুব কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল বলিয়াই তাহাদের ভিতরে শ্রম-বিভাগের একটি নির্দিষ্ট সীমা ছিল; গিল্ড এবং জাতের ভিতরে বেশী-সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করার রীতি ছিল না, সুতরাং স্বয়ং মালিককেও তখন খাটিতে হইত। এই অবস্থায় শ্রম-বিভাগ কখনো জটিল ও সূক্ষ্ম হইতে পারে না।

মেশিন ও আধুনিক শিল্পোৎপাদন

মেনুফেকচার উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের রীতি প্রবর্তন করিয়া শ্রমিককে অনেকখানি পুঁজির বশবর্তী করিয়াছে এবং শ্রমিককে দ্রব্যের মাত্র একটি অংশ উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করিয়াছে কিন্তু উৎপাদনের রীতি অর্থাৎ যন্ত্রাদির চেহারা বদলাইতে পারে নাই বলিয়া মেনুফেকচারকে হাতের কাজের উপরই নির্ভর করিতে হইত; যতক্ষণ হাতের কাজই উৎপাদনে প্রবল ছিল, ততক্ষণ শ্রমিক তাহার খেয়াল ও ইচ্ছাকে খানিকটা হইলেও খাটাইবার সুযোগ পাইত।

এই কারণেই পুঁজিপতির পক্ষে শ্রমিককে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা তখনও সম্ভব হয় নাই। ঘোড়ারও ইচ্ছা-অভিপ্রায় আছে, ছুটিতে ছুটিতে সে হঠাৎ থামিয়া যায়। শ্রমিক ত মানুষ; তাহার যখন একটি মস্তিষ্ক আছে, মাঝে মাঝে যে সে তাহার নিজের মাথা খাটাইয়া পুঁজিপতির ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু মুনাফা-অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য ইহা মস্ত একটা অন্তরায়। তাই কারখানায় নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার জন্য পুঁজিপতি উঠিয়া পড়িয়া লাগিল; নিয়ম প্রবর্তন করিলেন আর্করাইট; মেশিনের আবিষ্কার হইল।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, এত যে যান্ত্রিক আবিষ্কার হইতেছে তাহা মানুষের শ্রমকে লাঘব করিতে পারিয়াছে কি না তাহা সন্দেহজনক। মেশিনারীর পুঁজিতান্ত্রিক প্রয়োগের উদ্দেশ্য কখনও তাহা হইতেই পারে না। ইহার আসল উদ্দেশ্য হইল, শ্রমিকের অবশ্য শ্রমসময় কমাইয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়ানো।

মেনুফেকচারে পূর্ব উৎপাদন প্রণালী হইতে পার্থক্য ঘটিল এইখানে যে বহু শ্রমিকের শ্রম-শক্তি পণ্য হিসাবে বিক্রীত হইয়া একজন পুঁজিপতির অধীনে খাটানো হইতে লাগিল। বর্তমানের উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটিল উৎপাদনের যন্ত্রাদির রূপান্তরে। তাহা হইলে প্রথমই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হইবে, উৎপাদনের যন্ত্র হাতিয়ার (Tools) হইতে কি করিয়া মেশিনে পরিবর্তিত হইল। হস্তশিল্পের যন্ত্র কি করিয়া বর্তমানের কল-কব্জাকে জন্ম দিল।

কেহ কেহ বলেন, সরল মেশিনই হাতিয়ার, আর জটিল হাতিয়ার মেশিন। তাহারা দুইয়ের ভিতরে কোন মূলগত পার্থক্য দেখে না। অর্থ-নৈতিক বিচারের দিক হইতে এইরকমের ব্যাখ্যা মোটেই কার্যকরী হইতে পারে না; ইহার ভিতরে ঐতিহাসিক মালমসলা ও উপাদান বড় একটা নাই। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন, হাতিয়ারকে

চালায় মানুষের শক্তি ; মেশিনের পশ্চাতে পরিচালন-শক্তি মানুষের নয়, অপর-কিছুর—যেমন জন্তু, জল ও বায়ু প্রভৃতির। এই উক্তি অনুসারে ষাঁড় যখন লাঙ্গল টানে তখন লাঙ্গল নিশ্চই মেশিন। জন্তুর দ্বারা যন্ত্র-চালনা অতি পুরাকালেরই উদ্ভাবন, তাই বলিয়া কি অতি পুরাকাল হইতেই মেশিনের প্রচলন ছিল ?

পূর্ণবিকশিত মেশিনারীর তিনটি অংশ ; প্রথম প্রেরক-যন্ত্র (Motor-mechanism) ; দ্বিতীয় বাহন-যন্ত্র, (Transmitting) ; তৃতীয় হাতিয়ার অথবা কর্মকারীর যন্ত্রাদি (Working tool)। প্রেরকযন্ত্রই সকল মেশিনারীটিকে সক্রিয় করিয়া তুলে। ষ্টীম, ইলেকট্রিসিটি, জল, বায়ু ইত্যাদির দ্বারা প্রেরক-শক্তিটি কার্যকরী হইতে পারে। ফ্লাই হুইল, পুলি, দড়ি-দড়া প্রভৃতিই সাধারণ বাহন-যন্ত্রের কাজ করিয়া থাকে। মেশিনারীর কর্মকারী অংশই সর্বপ্রথম রূপান্তরিত হইয়া উৎপাদনে বিপ্লব আনিয়া দিল, শিল্প-বিপ্লবের প্রবর্তন করিল। এই কর্মকারী মেশিনই যে সকল হাতিয়ার হস্ত-শিল্পে ব্যবহৃত হইত তাহাদের সমবায়। এই হাতিয়ার প্রভৃতি মানুষ আর পূর্বের মত প্রত্যক্ষভাবে চালায় না ; কেননা ইহারা এখন একটি বৃহৎ মেশিনের অংশ হিসাবেই দেখা যায়। এখন হইতে ইহারা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের হস্তচালিত হাতিয়াররূপে দেখা দেয় না। সাক্ষাৎ ভাবে সূচদ্বারা মোজা তৈরী না করিয়া একাধিক সূচকে ষ্টকিং লুমের ভিতরে সন্নিবিষ্ট করিয়া লুমটিতে চালনাশক্তি আরোপ করা হয়। ছুরী দ্বারা প্রত্যক্ষত কাজ না করিয়া একাধিক ছুরীকে চপিং মেশিনের ভিতরে সন্নিবিষ্ট করিয়া তবে মাংস কাটার আয়োজন করা হয়। যে দেহটার ভিতরে হস্তশিল্পযুগের হাতিয়ার ইত্যাদিকে সন্নিবিষ্ট করিয়া কাজ করানো হয়, সেই দেহটির আবিষ্কার হইতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল যুগের শুরু গণনা করা যাইতে পারে। প্রকৃত মেশিন দ্বারা তাহা হইলে পূর্বযুগের হাতিয়ার

ইত্যাদিকেই মাত্র কাজ করানো হয়; পূর্বে মানুষ হাতিয়ারগুলিকে সাক্ষাৎভাবে কাজ করাইত, এখন ইহাদের পরোক্ষভাবে মেশিনের মারফৎ কাজ করানো হয়। চালনা-শক্তি যে উপায়েই প্রয়োগ করা হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় নাই। পূর্বযুগের সঙ্গে পার্থক্য সংঘটিত হয় হাতিয়ারের ব্যবহারের যে তারতম্য ঘটিল তাহা দ্বারা। মানুষকেই যদি হাতিয়ার চালাইতে হয়, তাহা হইলে সে কতগুলি হাতিয়ারের একসঙ্গে চালাইতে পারে? মানুষের হাতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। একহাতে একটির বেশী হাতিয়ার চালানো সম্ভব নয়; দুই হাতই যদি সমানভাবে চালানো সম্ভব হয় তাহা হইলেও বড় জোর দুইটি হাতিয়ার একসঙ্গে সে চালাইতে পারে। মেশিনে হাতিয়ার ব্যবহার করিতে গিয়া আমরা বেশী-সংখ্যক হাতিয়ারকে একসঙ্গে কাজে লাগাইতে পারি।

মেশিন যতই বৃহদাকার হইতে লাগিল মানুষের পক্ষে মেশিনে শক্তিচালনা দুরূহ হইয়া পড়িল। প্রথম অশ্ব, তারপর বায়ু, জল—এইসকল প্রাকৃতিক বস্তু দ্বারা মেশিন চালানোর ব্যবস্থা হইল। পরিশেষে দেখা দিল, ওয়াটের আবিষ্কৃত ষ্টিম-ইঞ্জিন। এই ষ্টিম-ইঞ্জিনের উপযোগিতা কোন একটি বিশেষ মেশিন চালনায়ই প্রকাশ হয় না, সকল রকমের মেশিন চালনায় অর্থাৎ সকল রকমের যান্ত্রিক-উৎপাদনেই ষ্টিম-ইঞ্জিন শক্তিসঞ্চারণের কার্য করিতে পারে।

মেশিনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হওয়ায় শ্রমিকদের উৎপাদন-শক্তি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি শ্রমিককেও সম্পূর্ণ ভাবে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে মেশিনের নিকট। শ্রমিকের উপর আধিপত্য এখন পুরাপুরিই প্রতিষ্ঠিত হইল। মেশিনের প্রয়োগ করিতে গিয়া এই হিসাবটি আমাদের দেখিতে হয়, ইহার প্রয়োগে যে পরিমাণ শ্রম অপক্রান্ত হইল, মেশিন প্রস্তুত করিতে তাহার চাইতে কম শ্রম লাগিল কি না।

কিন্তু পুঁজিপতির হিসাব আবদ্ধ থাকে আরও সংকীর্ণ সীমার ভিতরে। পুঁজিপতি যতখানি মূল্য শ্রমিক উৎপাদন করিয়াছে ততখানিই তাহাকে দিতে পারে না, সে দেয় শ্রম-শক্তির মূল্য। সুতরাং যে সকল শ্রমিকের জায়গায় মেশিনকে স্থাপন করা হয় তাহাদের শ্রম-শক্তির মূল্য হইতে যদি মেশিনের মূল্য কম হয় তবেই পুঁজিপতি মেশিনের প্রয়োগ করিবে। যে পরিমাণ শ্রম দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ মূল্য উৎপাদিত হয় পুঁজিপতি মেশিনের মূল্যকে তাহার সহিত তুলনা না করিয়া, তুলনা করে শ্রমশক্তির মূল্যের সহিত। যে মূল্য শ্রমিক উৎপাদন করে তাহা হইতে শ্রমশক্তির মূল্য কম। এবং ইহারই সহিত তুলনা করা হয় বলিয়া পুঁজিপতির পক্ষে মেশিনের বিস্তারিত প্রয়োগ সম্ভব হয় না। কিন্তু সমাজতন্ত্রীর ব্যবস্থায় মেশিনের প্রয়োগ হইবে আরো ব্যাপক ; কেননা তখন হিসাব করিয়া দেখা হইবে যে সকল শ্রমিকের পরিবর্তে মেশিনকে স্থাপন করা হইবে, তাহারা যে পরিমাণ শ্রম দিয়া মোট মূল্য উৎপাদন করে, তাহা হইতে মেশিনের মূল্য কম কি না। এখন দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের একটি মেশিন ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু সেখানে তাহার প্রয়োগ না হইয়া হয়ত বা তাহাকে রপ্তানী করা হইল আমেরিকায়। ইংলণ্ডে কতকগুলি উৎপাদনে মেশিনের প্রয়োগ হওয়ায়, অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে ; সুতরাং সেখানে শ্রমিকের মজুরী তাহার প্রকৃত শ্রমশক্তির মূল্যের নীচে নামিয়া আসে ; তাই ইংলণ্ডের পুঁজিপতি হিসাব করিয়া দেখিবে মজুরি যখন এ দেশে কম তখন মেশিনের পরিবর্তে মানুষকেই খাটানো যাউক। যে দেশে মজুরি বেশী সেখানেই মেশিন কার্য করিবে। মেশিন তৈয়ারীর জন্য যে প্রয়োজন তাহা হয়ত বা ঠিকই আছে ; কিন্তু মেশিন তৈয়ারীর জন্য যে সকল শ্রমিককে নিযুক্ত করা হইবে, কোন কারণে হয়ত বা তাহাদের মজুরী তাহাদের

শ্রম-শক্তির মূল্য অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এই অবস্থায় মেশিনের বাজার-দর বাড়িয়া যাইবে। পুঁজিপতি তখন মেশিন প্রয়োগ না করিয়া শ্রমিকের নিয়োগকেই শ্রেয় মনে করিবে। সমাজতন্ত্রে এই প্রকার হিসাব ও বিচারের স্থান নাই; কেননা শ্রমশক্তির মূল্য বলিয়া কোন জিনিস তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় থাকিতে পারে না। গত শতাব্দীতে দেখা গিয়াছে, ইংলণ্ড যান্ত্রিক আবিষ্কারের জন্মভূমি হইলেও, যন্ত্রের প্রয়োগ সেখানে ব্যাপকভাবে চলিতে পারিত না; সস্তায় মজুরের শ্রমশক্তি কিনিয়া যথেচ্ছ তাহাকে প্রয়োগ করিয়া নিরর্থক এবং নিতান্ত অমানুষিক ভাবে শ্রমশক্তির অপব্যবহার করা হয়; এই অপব্যবহার একমাত্র রোধ হইতে পারে সাম্যবাদী সমাজে।

মেশিনের প্রবর্তন হওয়ায় এখন আর শারীরিক শক্তির তেমন প্রয়োজন রহিল না। কেবলমাত্র পূর্ণবয়স্ক সবল শ্রমিকদের দ্বারাই কাজ করানো হইবে, এই অবস্থাটি উল্টাইয়া গেল। মেশিন প্রকৃত পক্ষে শ্রম লাঘব করিবে; কিন্তু ইহার ব্যবহার শুরু হওয়া মাত্র মেশিন সকলরকম মানুষকেই পুঁজিপতির পদানত করিল। পরিবারে আর কেহ বাদ রহিল না,—স্ত্রী, পুরুষ, শিশু—সকলেই মেশিনের চাহিদা মিটাইতে ছুটিয়া আসিল।

শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয়, শুধুই পূর্ণ বয়স্ক শ্রমিকের আপন জীবন-ধারণের উপযোগী উপকরণের মূল্য দ্বারাই নয়, তাহার সমস্ত পরিবারটির খাইয়া বাঁচিবার জন্য যাহা প্রয়োজন পুঁজিপতির নিকট হইতে শ্রমিকের তাহাই প্রাপ্য। কিন্তু মেশিন সমস্ত পরিবারটিকে পরিবারের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া আনায়; এখন স্ত্রী ও শিশুকে যখন কিছু কিছু দিতেই হয়, পুরুষকে সম্পূর্ণ মূল্য না দিলেও চলে। চারজনের একটি

পরিবারকে এখন মোট যাহা দিতে হইবে, তাহা হয়ত বা পূর্ণবয়স্ক একজনকে যাহা দিতে হইত তাহার চাইতে কিছু বেশী ; কিন্তু পুঁজিপতি এখন ৪ জনকে খাটাইয়া অনেক শ্রম আদায় করিয়া লইতে পারে ! মেশিন চলতি ব্যবস্থাকে অনেক ভাবেই বদলাইয়া দিয়াছে ; পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের ভিতরে চুক্তি সম্বন্ধটিও রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পুঁজিপতি এবং শ্রমিক পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল স্বাধীন মালিক হিসাবে, একজন মুদ্রার মালিক, অপরজন শ্রমশক্তিরূপ পণ্যের অধিকারী। পূর্বে শ্রমিক তাহার আপন শ্রমশক্তিই বিক্রয় করিত, এখন সে তাহার স্ত্রী এবং সন্তানাদিকেও সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করে। সুতরাং শ্রমিক এখন হইয়া দাঁড়াইল দাস-ব্যবসায়ী।

মেনুফেকচারের যুগে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকেরা পুঁজিপতির স্বেচ্ছাচারিতাকে যতখানি রুখিতে পারিত, এখন আর তাহাদের সে ক্ষমতা রহিল না। স্ত্রী এবং শিশু যতবেশী উৎপাদনে ঢুকিতে শুরু করিয়াছে, ততই পুঁজিপতির স্বৈরাচারকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা শ্রমিকদল হারাইয়া ফেলিল।

পুঁজিপতি শ্রমদিবসকে যত ঘণ্টা সম্ভব বাড়াইতে চায়। ইহাতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহার উপশমের জন্য রাষ্ট্র শ্রমদিবসকে আইন-কানুন প্রণয়ন করিয়া সীমাবদ্ধ করিতে বাধ্য হয়। তখন হইতেই একটি নূতন ঘটনা বিশেষ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমদিবসের ইচ্ছামত বিস্তার যখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, মনিব মুনাফার মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য অন্য কৌশলের আশ্রয় লইবে ; সীমাবদ্ধ সময় বলিয়াই এখন শ্রমকে পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রখর করিয়া তুলিতে হইবে।

মেশিন-চালনায় শ্রমিক যতই অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, তাহার হাত যে খুবই তাড়াতাড়ি চলিবে তাহা নিঃসন্দেহ ; পূর্বে হয়ত বা একটি মেশিনকে সে এক মিনিটে একবারই ঘুরাইতে পারিত, এখন সে এক

মিনিটে ১½টি পাক দিতে পারে। এই ফলাফলটি স্বাভাবিক নিয়মেই জাত হয়। কিন্তু যেমনই হউক, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেখানে একই কাজ সমানভাবে, একঘেয়ে রকমে দিনের পর দিন চলিতেছে, সেখানে শ্রমের সময় বাড়াইতে গেলে শ্রমের প্রখরতা অবশ্য কমিবে, আবার শ্রমের সময় কমাইলে শ্রমের প্রখরতা বাড়িবে। শ্রমিকাদির বিদ্রোহভাব প্রকাশ হওয়ায় পার্লামেণ্ট বাধ্যতামূলক আইন করিয়া শ্রমসময় নির্দিষ্ট করিয়া দিল। পুঁজিপতি তখন মেশিনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের স্বরূপের ভিতরেও পরিবর্তন দেখা দিল। সাধারণত আমরা জানি, আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করা হয় শ্রমিকের উৎপাদনশক্তিকে বাড়াইয়া, যেন একই সময়ে একই শ্রমের মাত্রা দ্বারা সে বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। বাধ্যতামূলক আইনদ্বারা শ্রমদিবসকে সংক্ষিপ্ত করিলে, একটি অন্যরকমের ঘটনা সৃষ্টি হয়। নির্দিষ্ট শ্রমদিবসটি যাহাতে পুরামাত্রায় সদ্ব্যবহার হয় তাহা দেখাই এখন হইয়া উঠে পুঁজিপতির লক্ষ্য। বিন্দুমাত্রও তাহাতে ফাঁক থাকিতে পারিবে না, শ্রমিক কিছুমাত্র অবসর খুঁজিতে পারিবে না— সুতরাং পূর্বেকার একঘণ্টা হইতে এখানকার এক ঘণ্টার শ্রমের খরচ হয় অনেক বেশী ; কাজে কাজেই একঘণ্টায় পূর্বে যে পরিমাণ উৎপাদন হইত, এখন তাহা হইতে বেশী হইবে। বেশী পরিমাণ শ্রম এখন ঘনীভূত হইল একই সময়ের ভিতরে। সুতরাং এখনকার একঘণ্টা পূর্বের হয়ত বা ১½ ঘণ্টার সমান। উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধির জন্য আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য ত বাড়িবেই, তাহা ছাড়া শ্রমের প্রখরতার জন্যও অবশ্য শ্রমদিবসের সময় কমিয়া উদ্বৃত্ত-শ্রমসময়ের মাত্রা বাড়িবে।

শ্রমের গাঢ়তা কি করিয়া বাড়ে, এখন আমরা সেই প্রশ্নেই আসিব। শ্রমদিবসকে সংক্ষিপ্ত করিলে, শ্রমিক অল্প সময়ে বেশী কাজ দিতে

পারে, তাহাতে অল্প সময়ে বেশী শ্রম ঘনীভূত হয়। শ্রমদিবসকে ছোট করা যখন বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়ায়, তখন পুঁজি ভাল ভাল মেশিনের সাহায্যে শ্রমিকের নিকট হইতে অধিক শ্রম নিংড়াইয়া লইতে সচেষ্ট হয়। মেশিনের সাহায্য লওয়া হয় দুই ভাবে—(১) মেশিনের গতি দ্রুত করা; (২) শ্রমিককে কাজের জন্য পূর্বের চাইতে বেশী মেশিন দেওয়া। মেশিনের উৎকর্ষ প্রয়োজন, কেননা তাহা না হইলে শ্রমিকের উপর ভালভাবে চাপ দেওয়া সম্ভব হয় না; তাহা ছাড়া, খরচ সংকোচ করিতে হইলেও এই উৎকর্ষের আবশ্যকতা আছে। ষ্টিম-ইঞ্জিনের আবিষ্কারের শুধুই যে পিষ্টনের গতি বাড়িয়াছে তাহা নয়, একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে কম কয়লা-খরচে বেশী মেশিন চালনা সম্ভবপর হইয়াছে।

হস্তশিল্প এবং মেনুফেকচার যুগে, শ্রমিক হাতিয়ারের সাহায্যে কাজ করে, কিন্তু ফ্যাক্টরীতে মেশিন শ্রমিককে কাজ করায়। প্রথমটিতে কি করিয়া কাজ করিতে হইবে না হইবে তাহার পরিকল্পনাদি করে শ্রমিক নিজেই। কিন্তু ফ্যাক্টরীতে সকল সময়ই শ্রমিককে মানিয়া চলিতে হয় মেশিনের নির্দেশ। মেনুফেকচারে শ্রমিক একটি জীবন্ত উৎপাদন ব্যাপারের অংশ-বিশেষ, কিন্তু, ফ্যাক্টরীতে রহিয়াছে একটি জীবনহীন যান্ত্রিক-ব্যাপার; শ্রমিক ইহার উপর একটি জীবন্ত গলগ্রহ মাত্র। যে কোনও পুঁজিবাদী উৎপাদন—যাহার উদ্দেশ্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ—মেশিনকে প্রয়োগ করে শ্রমিকের শ্রমকে সদ্ব্যবহার করার জন্য; মেশিন কর্তা, শ্রমিক মেশিনের দাস মাত্র। পুঁজিবাদী বর্তমান উৎপাদন-প্রণালীতে শ্রম এবং মস্তিকের ভিতরে সম্পূর্ণ ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া গেল। শ্রমিকের পক্ষে এখন আর নিজের মস্তিষ্ক খাটানো অথবা প্রবর্তনা-শক্তির প্রয়োগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তাহারা খালি শ্রমেরই অধিকারী। মস্তিষ্কের অধিকার একচেটিয়া হইয়া রহিল পুঁজিপতির।

পুঁজিপতি তাহার আপন মস্তিক হইতে একটি ফ্যাক্টরী কোড, (factory-code) সৃষ্টি করিবে। শ্রমিককে শায়েস্তা করার জন্য পুঁজিপতির প্রণীত শাস্তির ফিরিস্তি ভারি চমৎকার; ফ্যাক্টরী-লাইকারগাস, এমনভাবে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করে যে শ্রমিক কখনো কখনো কাজ না করিলে অথবা ফ্যাক্টরীতে যাইতে দেরী করিলে ফাইন স্বরূপ সে যাহা আদায় করে তাহার পরিমাণ মুনাফার চাইতে বেশী হয়। ফ্যাক্টরীর ভিতরে যে অবস্থায় শ্রমিককে কাজ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বলা চলে যে, যে পরিমাণ আলো, বাতাস ও দাঁড়াইবার স্থান শ্রমিকের প্রয়োজন তাহা পুঁজিপতি যত বেশী সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিতে পারিবে ততই তাহার মুনাফা বাড়িতে পারে। শ্রমিকের কাজের জন্য যথোপযুক্ত আলো, বাতাস ও দাঁড়াইবার স্থান চুরি করিতে পারাটাই হইয়া দাঁড়ায় পুঁজিপতির লক্ষ্য।

পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরোধ প্রথম হইতেই লাগিয়াই আছে। কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে তাহার বিরোধ শুরু হইয়াছে মেশিনের আবিষ্কার ও প্রবর্তনের সময় হইতে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক কখনো "মেশিন উৎপাদন-প্রণালীর ভিত্তি হউক" তাহা চাহিতে পারে না। ১৭ শতাব্দীতে প্রায় সারা ইউরোপে রিবণ-লুমের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। ১৬৮৫ খৃঃ-এ জার্মানীতে রাষ্ট্রের নিষেধে এই লুমটির প্রচলন ও ব্যবহার একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এভারেট ১৭৫৮ খৃঃ-এ সর্বপ্রথম পশম-কাটার মেশিন প্রস্তুত করিলে পর একলক্ষ লোক সমবেত হইয়া ইহাকে পুড়াইয়া দেয়। আর্করাইটের আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ৫০০০০ লোক একত্র হইয়া পার্লামেণ্টে দরখাস্ত পেশ করে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পনর বৎসর ইংলণ্ডের মেনুফেকচার-গুলিতে পাওয়ার-লুম প্রবর্তন করায়, সেখানে লুডাইট মুভমেণ্ট নামে মেশিন-ভাঙ্গনকারী একটি আন্দোলন সৃষ্টি

হয় ; সিউমাউথ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়াশীল এন্টি জেকোবিন গভর্ণমেণ্টগুলি ইহার সুযোগ নিয়া নৃশংসভাবে অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। শ্রমিকদের প্রথমটায় মনে হইত মেশিনই বুঝি তাহাদের শত্রু, কেননা মেশিনের প্রবর্তন করিলেই কতকগুলি শ্রমিক কাজ হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইত। ধীরে ধীরে যেমন তাহাদের অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল, তাহারা বুঝিতে পারিল মেশিন প্রকৃত পক্ষে তাহাদের শত্রু নয়, মেশিনের পুঁজিবাদী প্রয়োগই তাহাদের কর্মহীনতার কারণ। তখন হইতে তাহারা সংগঠিত হইতে লাগিল অন্যভাবে, মেশিন ভাঙ্গন নয়, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হইতেই তাহাদের মুক্তি সম্ভব।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বলিয়া থাকে মেশিনের প্রয়োগে যে সকল শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়, তাহাদের পুনরায় নিয়োগের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তাহাও সাথে সাথে বাহির হইয়া আসে। সুতরাং শ্রমিকগণের বেকার হওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। খালি শ্রমিকই যে কর্মচ্যুত হয় তাহা নয়, তাহাদের পুনরায় নিয়োগ করিবার মতন পুঁজিও খালাস হয়।

ধরা যাউক, একটি কার্পেট ফ্যাক্টরীতে ১০০ শ্রমিক কাজ করে। তাহাদের বার্ষিক মজুরী প্রতিজনে ৩০ পাউণ্ড ; সুতরাং বৎসরে পুঁজিপতির খরচ করিতে হয় ৩০০০ পাউণ্ডের পরিবর্তমান পুঁজি। এখন সে ৫০ জন মজুরকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিয়া ১৫০০ পাউণ্ড মেশিনে খরচ করিল ; কাঁচামালের মূল্য পূর্বে যেমন ৩০০০ পাউণ্ড ছিল, এখনও তাহাই রহিল। এই পরিবর্তনের পূর্বে মোট ৬ হাজার পাউণ্ডের ভিতরে ৩ হাজার পাউণ্ড ছিল অপরিবর্তমান অংশ, এবং বাকী তিন হাজার পরিবর্তমান অংশ। পরিবর্তনের পর, প্রথম অংশটি হইল সাড়ে ৪ হাজার পাউণ্ড, দ্বিতীয়টি দেড় হাজার পাউণ্ড। অর্থাৎ নূতন ব্যবস্থায় পরিবর্তমান মোট অংশ পুঁজির চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। তাহা

হইলে দেখা গেল, মজুর কমাইয়া যে অর্থ খালাস করা হইল, তাহা এমন ভাবে আটকাইয়া রাখা হইল যে শ্রম-শক্তি ক্রয় করিবার জন্য তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। এই ভাবেরই ব্যবস্থা যদি চলে তাহা হইলে ৬ হাজার পাউণ্ডে ৫০ জন মজুরকেই মাত্র খাটানো যাইতে পারে। মেশিনের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আরো কম মজুর খাটানো হইবে। নূতন মেশিনের দাম যদি দেড় হাজার পাউণ্ড না হইয়া এক হাজার পাউণ্ড হয়, তবে ৫০০ পাউণ্ড আন্দাজ পুঁজি খালাস হইতে পারে। এই ৫০০ পাউণ্ডকে পুঁজি হিসাবে খাটাইলে পূর্বেকার মজুরীতে ৫০ জন শ্রমিকের ভিতরে ১৬ জনকে কাজ দেওয়া যাইতে পারে, তাও সম্ভব নয়; কেননা ৫০০ পাউণ্ডের ভিতরে একটি অংশ অপরিবর্তমান পুঁজি হিসাবে খাটিবে অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করিতে খরচ হইবে; সুতরাং ১৬ জনেরও কম শ্রমিক নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাইবে। এই দৃষ্টান্তটি হইতে কি প্রমাণ হয় যে, মেশিনের প্রয়োগে শ্রমিক যেমন কর্মচ্যুত হয় তেমনি পুঁজিও খালাস হইয়া সেই সকল শ্রমিককে উৎপাদনে পুনর্নিয়োগে সাহায্য করে? আমরা দেখিলাম, মেশিন যে সংখ্যক শ্রমিককে বেকার করিল, তাহার চাইতে অনেক কম শ্রমিককে পরে কাজ দিতে পারে। এই সকল শ্রমিকেরা বেকার হওয়ায় তাহারা পূর্বে যে সকল দ্রব্যাদি গ্রাসাচ্ছদনের জন্য ক্রয় করিত তাহা আর কিনিতে পারিবে না। ফলে, যে সকল কারখানায় গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণাদি প্রস্তুত হয়, সেখানেও উৎপাদন সঙ্কুচিত হইবে, অনেক শ্রমিককে কাজ হইতে অবসর দেওয়া হইবে; বেকারগ্রস্তদের সংখ্যা আরো বাড়িয়া যাইবে। শুধু তাহাই নয়, গ্রাসাচ্ছাদন তৈয়ারীর উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর প্রয়োজন হইবে কম, সুতরাং সে সকল কারখানা হইতেও বহু শ্রমিক

বিদায় লইতে বাধ্য হইবে। এইভাবে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে, যে সকল কারখানায় শ্রমিকেরা এখনও কাজে আছে পুঁজিপতির পক্ষে তাহাদের মজুরী কমাইয়া দেওয়ার সুযোগ হইবে। ফলে শ্রমিকদের হাতে অর্থ কমিয়া তাহাদের ক্রয়-শক্তি এত হ্রাস পাইবে যে বাজারে দ্রব্যাদির চাহিদার খুবই পড়্‌তি দেখা যাইবে। এই ভাবে অর্থ সঙ্কটের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

কৃষির ভিতরে ঢুকিয়া বর্তমান উৎপাদন-প্রণালী পুরাতন উৎপাদন-প্রথার সংরক্ষক কৃষককুলকে উৎসন্ন করিয়াছে। তাই, শহরে যেমন, তেমনি গ্রামেও শ্রেণী বিরোধ একই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষি ও মেনুফেকচারের ভিতরে পূর্বে যে সংযোগ ছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদনপ্রথা সম্পূর্ণভাবে তাহার মূলোৎপাটন করিল। কিন্তু তাহা করিলেও, ইহা কৃষি ও শিল্পের ভিতরে ভবিষ্যতে আরো উচ্চস্তরের একটি সংযোগ ও মিলনের রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে। বর্তমান বিচ্ছেদ সাময়িক। কৃষকগণকে জমিহীন-মজুরে পরিণত করিয়া পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালী তাহাদের জীবনীশক্তিকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়াছে, তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া মুনাফা-বৃদ্ধির সুযোগ খুঁজিয়াছে; সর্বোপরি বিভিন্ন জায়গায় কৃষকেরা ছড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া ও এই জন্য তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে না পারায় পুঁজির দৌরাত্মকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাহারা হারাইয়াছে। শহরে শ্রমিকেরা একই জায়গায় অথবা পাশাপাশি বহু লোক সমবেতভাবে কাজ করে বলিয়া সংঘবদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে খুব কঠিন হয় না। শ্রমিকেরা তাই শ্রেণী-বিরোধের সংগ্রামে কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। পুঁজি-তান্ত্রিক কৃষিকার্যে শুধুই শ্রমিককেই যে শোষণ করা হয় তাহা নয়, ভূমিকে শোষণ করিয়া তাহার উর্বরাশক্তি নষ্ট করাও ইহার উদ্দেশ্য। ক্ষণিকের জন্য হয়ত বা জমির উন্নতি সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু জমির উর্বরাশক্তির

মূল যে ক্রমেই নষ্ট হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। তাহা হইলে দেখা গেল, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনে সকল ধনদৌলতে মূল মানুষ ও জমি, দুইই শোষণ হইতে রেহাই পায় নাই।

শ্রম-প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক রূপগুলিকে বাদ দিয়া ইহার সম্পর্কে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতি ও মানুষের ভিতরে একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছাড়া ইহা আর অন্য কিছুই নয়। সমস্ত শ্রম-প্রক্রিয়াটিকে যদি আমরা ফলাফলের দিক হইতে লক্ষ্য করি, তবে দেখিতে পাইব শ্রমের যন্ত্রপাতি ও শ্রমের বিষয় (কাঁচমাল ইত্যাদি) সকলই উৎপাদনের উপকরণ।

শ্রম-প্রক্রিয়া যতক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে নির্বাহিত হয়, ততক্ষণ সকল রকম কাজ একজন শ্রমিককেই করিতে হয়। পরে পরে এই কাজগুলি বিভাগ হইয়া বিভিন্ন লোকদ্বারা সম্পন্ন হয়। একজন ব্যক্তি যখন প্রকৃতি হইতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করে, তখন সেই তাহার নিজের কর্তা; মনিব বলিয়া কেহ থাকে না। শ্রমকারী যদি মাত্র একজন লোকই হয়, তাহা হইলে মাংসপেশীর চালনা যেমন সে করে, তেমনি বুদ্ধিও খাটাইতে হয় তাহার নিজেকেই। তখন মাথা ও হাতের কাজ একজন লোকের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়। কালক্রমে ইহারা পরস্পরের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং এমনকি একে অন্যের মারাত্মক শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। দ্রব্য-উৎপাদন তখন আর একজনের কাজ থাকে না, সমবায় শ্রমদ্বারা দ্রব্য উৎপাদিত হইতে থাকে। এই সমবায়ের ভিতরে ব্যক্তিগত শ্রমিকেরা মাত্র বিশেষ-বিশেষ অংশ সম্পাদন করিয়া থাকে। এইভাবের সমবায়-শ্রম প্রবর্তিত হইলে, শ্রমের সংজ্ঞা খানিকটা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। পুজিতান্ত্রিক উৎপাদনে শ্রমিক শুধু পণ্যই উৎপাদন করে না, ইহার মূল-কথা হইল উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন। শ্রমিক উৎপাদন করে নিজের ভোগের জন্য নয়, পুঁজিপতির মুনাফার জন্য।

স্বতরাং শ্রমিক উৎপাদন করে—শুধু এইটুকু বলিলে কিছুই বোঝা গেল না, তাহাকে উৎপাদন করিতে হইবে উদ্বৃত্ত-মূল্য। যে শ্রমিক পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য স্বষ্টি করে এবং পুঁজির প্রসারের সাহায্য করে সেই যথার্থ উৎপাদনকারী। অন্য রকমের একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝানো সহজ হইবে। একটি শিক্ষক বিদ্যাদান করিয়া নিজে উপার্জন করে ভাল কথা, কিন্তু শিক্ষাদান করিয়া তাহার মনিবের জন্য যদি সে মুনাফা স্বষ্টিরও ভার লয়, তবে তাহাকে শিক্ষালয়-ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ছাড়া আর কি বলা চলে? পুঁজিপতি চিনির কারখানায় পুঁজি না খাটাইয়া যে শিক্ষা-নিকেতনে পুঁজি খাটাইয়াছে, তাহাতে কিছুই তারতম্য হয় নাই; কেননা তাহার লক্ষ্য উৎপাদনের রকম নয়, মোটারকমের মুনাফা আত্মসাৎ করাই তাহার লোভ। স্বতরাং উৎপাদনকারী শ্রমিক বলিতে আমরা শ্রমিক এবং তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের ভিতরের সম্বন্ধই বুঝি না; বাস্তবিক ইহা একটি সমাজ-ঘটিত সম্বন্ধ এবং একটি বিশিষ্ট প্রকারের সমাজ-অবস্থা; ইতিহাসের পরিবর্তন হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়াছে। স্বতরাং উৎপাদনকারী শ্রমিক হওয়া মোটেই সৌভাগ্যের বিষয় নয়, শ্রমিকের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য মাত্র।

যে সময়টুকু শ্রমিকের পক্ষে তাহার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী মূল্য উৎপাদনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন সেই সময়ের অধিক শ্রমিককে খাটাইয়া যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন করা হয়, তাহাকে আমরা 'অনপেক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য' আখ্যা দিয়াছি। মোটামুটি ইহাই হইল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ভিত্তি, এবং 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য' অর্জনের ইহাই হইল শুরু। পরবর্তী উদ্বৃত্ত-মূল্যটি পাইতে হইলে পূর্ব হইতেই শ্রমদিবসের অবশ্য শ্রমসময় ও উদ্বৃত্ত শ্রমসময়—এই দুইভাবে ভাগ চাই। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়াইতে হইলে এমন ভাবের ব্যবস্থা চাই যেন অবশ্য-শ্রমসময় কমানো সম্ভব হয়। অনপেক্ষ উদ্বৃত্ত-মূল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণ-

ভাবে শ্রমদিবসের বিস্তারের উপর ; আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য জাত হয় উৎপদেনের যন্ত্রপাতির সংস্কার হইতে। যন্ত্রপাতির পরিবর্তন দ্বারা শ্রমিকের দাসত্ব সম্পূর্ণ কায়েমী করিয়া লওয়া হয়।

শ্রমিক শ্রমদিবসের সবগুলি ঘণ্টাই তাহার ভরণপোষণের উপযোগী মূল্য উৎপাদনের জন্য দাবী করিয়া বসিলে অপরের জন্য বিনা-মজুরীতে খাটার সময় তাহার হাতে অবশিষ্ট থাকে না। শ্রমিকের শ্রমের ভিতরে একটি বিশিষ্ট মাত্রার উৎপাদনী-শক্তি যদি না থাকে, তবে অপরের মুনাফা সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত সময় থাকিতে পারে না। এই অতিরিক্ত সময় শ্রমিকের হাতে না থাকিলে উদ্বৃত্ত-শ্রমসময় জাত হইতে পারে না ; পুঁজিপতি, অভিজাত,—এককথায় বৃত্তধিকারী জাতিটিরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

মনে হয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভিত্তিটি যেন একটি অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা ; স্বাভাবিক কথাটি আমরা ব্যবহার করিলাম খুব ব্যাপক অর্থে। একজন মানুষ যদি অপর একজন মানুষের মাংস খাইতে চায়, তাহা হইলে যেমন প্রাকৃতিক কোন বাধা নাই, তেমনি একজন লোক নিজে না খাটিয়া যদি অপর লোকের উপরে খাটুনির ভার চাপাইয়া দিয়া নিজে অবসরভোগী হইতে চায় তাহা হইলেও কোনরূপ বাধা জন্মায় না। শ্রমের উৎপাদনী-শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ অনৈতিহাসিক ধারণা না থাকাই উচিত। মানুষ যখন ঠিক পশুস্তর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে ও তাহার শ্রম খানিকটা সামাজিক-শ্রমে পরিণত হইয়াছে, তখনই একজন লোককে অপর একজন লোক উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের জন্য নিয়োগ করিতে পারে। সভ্যতার গোড়াতে শ্রমের উৎপাদনী-শক্তি ছিল খুবই অল্প, মানুষের অভাব এবং চাহিদাও তখন তেমন বাড়ে নাই। সে-সময়ে পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-ধারণ করিত খুবই মুষ্টিমেয় লোক। শ্রমের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে এই

শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করে। ধীরে ধীরে পুঁজির এবং আনুষঙ্গিক সমাজ-সম্পর্কগুলির আবির্ভাব হয়; এই আবির্ভাব একদিনের ইতিহাস নয়, যুগে যুগে অর্থনৈতিক পরিবর্তন হইতে বহুসহস্র শতাব্দীর ব্যবধানে এই অতি ভয়ঙ্কর শ্রেণীবিভেদমূলক পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

সামাজিক উৎপাদন কতখানি বিকশিত হইয়াছে, শুধু তাহাই না দেখিয়া আরো একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদন না করিয়া সমষ্টিগতভাবে উৎপাদনে উৎপাদন-শক্তি অবশ্য বাড়িবে, কিন্তু প্রাকৃতিক কতকগুলি ব্যাপারেও উৎপাদন-শক্তির তারতম্য হয়। ইহাদের দুইভাগে ভাগ করিয়া আমরা দেখিতে পারি। (১) প্রাকৃতিক ধন-দৌলত, অর্থাৎ জীবন-ধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি; ফল-মূল ও মৎস্যাদি। (২) উৎপাদনের সহায়ক বিষয়াদি; জল-প্রপাত, নদী, জঙ্গল, ধাতু, কয়লা ইত্যাদি; সভ্যতার প্রারম্ভে প্রথম শ্রেণীর জিনিষগুলিরই হয় বেশী প্রয়োজন। কিন্তু সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে দ্বিতীয় স্তরের জিনিস ও বিষয়গুলিই উপযোগী হয় বেশী। এখনও যদি আমরা ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের তুলনা করি, উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

কষ্ট করিয়া যে সকল অভাব মিটাইতে হয় তাহাদের সংখ্যা যদি অল্প হয়, জমির উর্বরাশক্তি যদি বেশী হয়, জল-বায়ু ও প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুকূল হয়, উৎপাদনকারীর জীবন-ধারণের জন্য যে পরিমাণ শ্রম দেওয়া আবশ্যক তাহা কম হইলেও চলিতে পারে। সুতরাং যে শ্রম করে তাহার অতিরিক্ত সময়ও থাকে প্রচুর, এই সময়ের ব্যবহার সে করিতে পারে অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য। প্রাচীনযুগের মিশরীয়দের সম্পর্কে এই কথা খুবই খাটে। প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল ছিল বলিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাদের শ্রম-

সময়ের পরিমাণ ছিল খুবই কম; প্রচুর সময় তাহাদের হাঁতে থাকিত; তাই ধনিকের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা বড় বড় সৌধ এবং অত্যাশ্চর্য পিরামিড তৈয়ারী করিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের তাজমহল ইত্যাদির পশ্চাতেও উদ্বৃত্ত-শ্রম-সময়ের প্রাচুর্যের ইতিহাসই লুক্কায়িত আছে।

এইখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। প্রকৃতি যেখানে তাহার দানে কার্পণ্য করে না, সেখানেই প্রকৃতি মানুষকে শিশুর মতন তাহার নিজের আয়ত্তে রাখে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মানুষ সেখানে আপন শক্তি ও প্রতিভাকে বিকশিত করিতে পারে না। পুঁজিতন্ত্রের দেশগুলিতেই ইতিহাস খুঁজিলে আমরা দেখিতে পাই, পাশ্চাত্যের নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলিতেই প্রথম পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, প্রাচ্যের গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে নয়। প্রথমোক্ত দেশগুলিতে প্রকৃতির কৃপণতা অধিক, তাই এখানকার মানুষের পক্ষে বিকাশের সুযোগ মিলিয়াছে পূর্বে।

অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম্ভাব্যতার নির্দেশ পাওয়া চলে। শ্রমের প্রকৃতিগত পরিবেশের তারতম্য দ্বারা এইটুকুই বোঝা যায়, একটি বিশেষ সময় কাজ করিয়া কতখানি জীবন-ধারনের উপকরণ উৎপাদিত হইতে পারে। ইহা হইতেই ঠিক হইবে, বিভিন্ন দেশে অবশ্য শ্রমসময়ের পরিমাণ কিরূপ। প্রাকৃতিক পরিবেশ নিরূপণ করিয়া দিবে, কত ঘণ্টা শ্রমের পর হইতে উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহের শ্রম-সময় শুরু হইবে। যতই শিল্প অগ্রসর হইবে ততই এই প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সময়ের পরিসর ছোট হইবে। শিল্প-প্রধান দেশে শ্রমিক জীবন-ধারণের জন্য শ্রম করিবার অধিকার ক্রয় করে, এই অধিকারের জন্য পুঁজিপতিকে সে উদ্বৃত্ত-মূল্য রূপ দাম দিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থাটি হইতে সাধারণত ইহাই মনে হয়, অতিরিক্ত উৎপাদন বুঝি শ্রমের একটি

নিজস্ব ধর্ম। এসিয়াটিক আর্কিপেলাগোর একজন অধিবাসীর কথাই ধরা যাউক। অতি সহজেই, প্রায় বিনা আয়াসেই সে একটি সাগু গাছ হইতে ৩০০ হইতে ৬০০ পাউণ্ড পর্যন্ত সাগু সংগ্রহ করিয়া থাকে। সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ একটি শ্রমদিবস কাজ করিলেই তাহার সমস্ত রকমের অভাব মিটিতে পারে। প্রকৃতি তাহাকে প্রচুর অবসরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। এই পর্যাপ্ত অবসরের যদি সমুচিত সদ্ব্যবহার করিতে হয় তবে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশেই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু বিদেশাগত পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-মূল্য জোগানোর জন্যই যদি এই অবসরের ব্যবহার করিতে হয় তবে তাহার পূর্বে প্রয়োজন জুলুম ও জবরদস্তি দ্বারা তাহাকে বাধ্য করা। সেখানে যেই পুঁজিতান্ত্রিক রীতি প্রবর্তন করা গেল, অমনি একদিনের শ্রম দ্বারা আপন ভরণপোষণের সংস্থান করিবার জন্য আরো ছয়দিন আর্কিপেলাগো অধিবাসীকে পুঁজিপতির জন্য খাটিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই অবস্থায় দেখা গেল, প্রকৃতির দানের প্রচুরতা দ্বারা মোটেই ব্যাঘাত হইবে না, কেনই বা সে সারা সপ্তাহ কাজ করিবে, অথবা সাতদিনের ভিতরে ছয়দিনের খাটুনি দ্বারা পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য জোগাইবে। প্রকৃতির দানশীলতা খালি এতটুকুই বলিয়া দেয় যে নিজের ভরণপোষণের জন্য একদিন কাজ করিলেই চলিতে পারে; বাকী ছয় দিনের ইতিহাস সম্পূর্ণই সামাজিক। ইহা প্রমাণিত হইল উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টি শ্রমের অন্তর্নিহিত কোন শক্তি দ্বারা হয় না।

মজুরী

বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকের মজুরীকে মনে হয় যেন ইহা শ্রমেরই মূল্য ; একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের জন্য এই মূল্য একটি বিশেষ পরিমাণের মুদ্রায় প্রকাশিত হয়। তাই সাধারণত আমরা মজুরীকে শ্রমের মূল্য বলিতে দ্বিধা করি না। কিন্তু পণ্যের মূল্য কাহাকে বলে? একটি পণ্য তৈয়ারীতে যে শ্রম ব্যয় করা হয়, তাহাই পণ্যের মূল্য। এই শ্রমকে আমরা পরিমাপ করি কি ভাবে? যে সময়টুকু শ্রম করা হয়, সেই সময়ের আয়তন দ্বারা। ধরা যাউক, শ্রম করা হইয়াছে বার ঘণ্টা ; এখন যদি বলি শ্রমের মূল্য, তাহা হইলে ইহা হইয়া দাঁড়ায় ১২ ঘণ্টার মূল্য। বার ঘণ্টার মূল্য নিশ্চয়ই বার ঘণ্টা। এইরূপ বলা নিতান্তই হাস্যকর। তাই শ্রমের মূল্য বলা অসঙ্গত। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি মূল্য প্রকৃত পক্ষে শ্রম-শক্তির।

পণ্য হিসাবে বাজারে বিক্রীত হইতে হইলে শ্রমের পূর্ব হইতেই স্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু শ্রমিক যদি শ্রমকে স্বাধীন অস্তিত্ব দিয়া বাজারে বিক্রয়ই করিতে পারিত, তাহা হইলে সে পণ্যই বিক্রয় করিত, শ্রম বিক্রয় করিত না।

১২ ঘণ্টায় যে মূল্য উৎপাদিত হয় তাহার সমস্ত অংশটিই যদি শ্রমিক পায় তাহা হইলে পুঁজিতন্ত্র দাঁড়াইবে কিসের উপর ; পুঁজিপতির মুনাফা আসিবে কোথা হইতে?

যাই হউক, বাজারে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতির সম্মুখীন হয় শ্রমিক, শ্রম নয়। শ্রমিক যে পণ্যটি বিক্রয় করে তাহাকে বলা হয় শ্রমশক্তি। শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তির প্রয়োগ দ্বারা কারখানায় শ্রম শুরু করা মাত্রই তাহা হয় পুঁজিপতির স্বত্ব। শ্রম আত্ম-প্রকাশ করে কারখানায় ; কারখানার যাবতীয় জিনিসের মালিক পুঁজিপতি ; সুতরাং শ্রমিক

তাহা বিক্রয় করিবে কোন অধিকারে? শ্রম-মূল্যের সারবস্তু, ইহা পণ্যের ভিতরে লুকাইত থাকিয়া পণ্যের মূল্যের পরিমাপক হয়—ইহার নিজের কোন মূল্য নাই। সুতরাং শ্রমের মূল্য একটি কাল্পনিক ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথায় এই সকল অযৌক্তিক কল্পনার বিশেষ প্রয়োজন থাকে।

ক্লাসিকেল পলিটিকেল ইকনমি প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবন হইতে শ্রমের বাজার-দর' এই কথাটি নির্বিচারে ধার করিয়া লইয়াছে। তাহাদের একমাত্র প্রশ্ন কি করিয়া এই বাজার-দর নিরূপিত হয়? উত্তরে তাহারা বলে, শ্রমের চাহিদা এবং জোগান দ্বারা এই বাজার-দর নিরূপিত হইবে; শীঘ্রই তাহারা দেখিতে পায় যে এই বাজার-দর এক-একদিন এক-এক রকমের হইয়া থাকে; কিন্তু প্রতিদিনের এই বিভিন্ন বাজার-দরেরও যে একটি মধ্যক রহিয়াছে তাহা ইহারা স্বীকার করিয়াছেন। এই মধ্যকটিই ইহাদের মতে 'স্বাভাবিক বাজার-দর'। কিন্তু ইহার যথার্থ অর্থ ক্লাসিকেল পলিটিকেল ইকনমি তলাইয়া দেখে নাই। এই স্বাভাবিক বাজার-দরটি নিরূপিত হয় পণ্যের উৎপাদন-খরচা দ্বারা। কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন-খরচা কি? শ্রমিক নিজেকেই প্রতিদিন উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করিতেছে। তাহার একটা খরচা আছে। শ্রমিকের নিজেকে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন শ্রমশক্তি উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ছাড়া অন্য কিছু কি? সুতরাং বুর্জোয়া ইকনমিষ্টদের 'শ্রমের মূল্য' প্রকৃতপক্ষে 'শ্রমশক্তিরই মূল্য'।

একদিনের বার ঘণ্টা শ্রমিককে কাজ করাইয়া ছয় ঘণ্টায় সে যে মূল্য উৎপাদন করে তাহাই তাহাকে শ্রমশক্তির মূল্য হিসাবে দেওয়া হয়। ধরা যাউক, এই মূল্যের পরিমাণ ৩ শিলিং; পুঁজিপতি বলিয়া থাকে, একদিনের শ্রমের জন্য শ্রমিককে ৩ শিলিং মজুরী দেওয়া হইল। এই উক্তির অসারতা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কিন্তু যতই অযৌক্তিক

হউক ইহাতে পুঁজিপতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন হয়। শ্রমশক্তির মূল্য মজুরীতে পরিণত হইল; কিন্তু বলার কায়দায় অর্থাৎ 'একদিনের জন্য মজুরী' এই ভাবের উক্তিতে আসল সত্যটি ঢাকা পড়িয়া গেল। 'একদিনের জন্য মজুরী' বলাতে মনে হয় মজুরকে কিছুমাত্র ঠকানো হয় নাই; সে যতখানি শ্রম করিয়াছে তদনুরূপই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ লোকের নিকট এই ভাবের উক্তিতে ভ্রম জন্মে যে শ্রমদিবসটি বুঝি অবশ্য শ্রমসময় এবং উদ্বৃত্ত-শ্রমসময় এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। মধ্যযুগের 'কর্ভি-ব্যবস্থায়' (corvee system) স্পষ্টই দেখা যায়, কৃষক সপ্তাহে চারদিন ভূস্বামীর জমিতে কাজ করিতেছে এবং বাকী তিনদিন নিজের জমিতে কাজ করিতেছে। এক সপ্তাহের ভিতরে যে দুইটি ভাগ রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভ্রম জন্মিবার কারণ নাই। অতীতযুগের দাসত্ব-ব্যবস্থায় মনে হয় দাস বুঝি সবটা সময়ই তাহার প্রভুর জন্যই খাটিতেছে; খাটুনির পুরাসময়টির ভিতরে অবশ্য-শ্রমসময়রূপ যে একটি অংশ আছে একেবারেই ঢাকা পড়িয়া যায়। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মজুরী-রূপটি অন্য রকমের ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়। একদিনের জন্য মজুরী বলাতে মনে হয় যেন শ্রমিক বুঝি ১২ ঘণ্টা শ্রম করিয়া যাহা উৎপাদন করিয়াছে তাহার সবটুকু অংশই মজুরী হিসাবে পাইয়াছে; শ্রমদিবসের একটি অংশ যে উদ্বৃত্ত-শ্রমসময় তাহা একেবারেই ঢাকা পড়িয়া গেল।

এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম শ্রমশক্তির মূল্যকে মজুরী নামে অভিহিত করার সার্থকতা কি। শ্রমশক্তি মূল্যের বাহ্যিক রূপ মজুরী প্রকৃত অবস্থাটিকে এবং মানুষে-মানুষে যথার্থ সমাজ-সম্পর্কটিকে ইহা গোপন রাখিয়া উল্টা জিনিসটিকেই দেখাইয়া দিয়াছে। এই

বাহ্যিক রূপটিই হইল শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে চুক্তির এবং আইনের ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি ; শুধু তাহাই নয় পণ্ডিত ইকনমিষ্টদের ও জনসাধারণকে ফাঁকি দিবার একটি মস্ত উপায়।

ইতিহাস হয়ত বা বর্তমান সময়ে এই বিষয়টিকে তলাইয়া দেখিতেছে ; কিন্তু এই বাহ্যিকরূপটির প্রয়োজনীয়তা পুঁজিপতি বর্তমান উৎপাদন-প্রথার গোড়াতেই উপলব্ধি করিয়াছে।

মজুরী বহু রকমের রূপ লইয়া থাকে। শ্রমশক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় করা হয়। দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক শ্রমশক্তির মূল্য টাইম-মজুরীর রূপে পরিবর্তিত হয় ; এই টাইম-মজুরীকে আমরা দিন-মজুরীর রূপে দেখিতে পারি।

বার ঘণ্টা কাজ করিয়া শ্রমিক হয়ত বা ৩শিলিং উপার্জন করে, প্রতি ঘণ্টায় তাহা হইলে তাহার উপার্জন হয় ৩ পেন্স ; ইহাকে বলা হয় শ্রমের বাজার-দর। সাপ্তাহিক অথবা দৈনিক মজুরীর পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে শ্রমদিবসের ঘণ্টার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের বাজার-দরও বিভিন্ন হইতে পারে। শ্রম-দিবস বার ঘণ্টা হইলে ৩ পেন্স হয় শ্রমের বাজার-দর, কিন্তু ১৫ ঘণ্টা হইলেই ইহা অনেকখানি নামিয়া আসে।

তাহা হইলে দেখা গেল শ্রমের বাজার-দর কমিলেও দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক বাজার-দর একই পরিমাণের থাকিতে পারে। আবার ইহাও সত্য, শ্রমের বাজার-দর যদিও একই থাকে অথবা কমেও, তবু দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক মজুরী বাড়িতে পারে। শ্রমদিবস যদি দশ ঘণ্টা হয় এবং শ্রমশক্তির দৈনিক মূল্য হয় ৩ শিলিং, তবে প্রতি ঘণ্টার বাজার-দর হইবে ৩$\frac{৩}{৫}$ পেন্স। এখন শ্রমিককে দিয়া ১২ ঘণ্টা কাজ করান হইলে এবং শ্রমের বাজার-দর পূর্বের মতনই থাকিলে, তাহার দিন-মজুরী হইবে ৩ শিলিং ৭$\frac{১}{৫}$ পেন্স।

পুঁজিপতি যদি শ্রমিককে শ্রমদিবসের নির্দিষ্ট ঘণ্টা না খাটাইয়া কম ঘণ্টা খাটায় অথচ প্রতি ঘণ্টার জন্য পূর্বের প্রতি ঘণ্টার অনুরূপই দেয়, তাহা হইলে দিনের অথবা সপ্তাহের নির্দিষ্ট মজুরী তাহাকে না দিলেও চলে। ধরা যাউক যেন শ্রমিককে ৬ ঘণ্টা খাটানো হইল এবং তাহাকে দেওয়া হইল মাত্র পূর্ব-নির্দিষ্ট ১০ ঘণ্টার শ্রমদিবসের প্রতি ঘণ্টার বাজার-দর হিসাবে; ৬ ঘণ্টায় শ্রমিক প্রতি ঘণ্টার বাজার-দরের ৬ গুণ পাইল বটে কিন্তু শ্রমশক্তির মূল্যের অনুরূপ দিনমজুরী সে পাইল না। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রমিক প্রতিদিনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতখানি তাহার না হইলেই না হয়, তাহা পাইল না; কিন্তু প্রতি ঘণ্টার অর্ধেক ঘণ্টায় যে মূল্য জাত হইল পুঁজিপতি তাহা উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে সংগ্রহ করিল। পুঁজিপতি বাহ্যত দেখাইতে পারিল, শ্রমিককে ঘণ্টা হিসাবে তাহার মজুরী মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু শ্রমিক যে তাহার জীবনধারণের উপযোগী মূল্য পাইল না অথচ পুঁজিপতি তাহার মুনাফা যাহা পাইবার তাহা উঠাইয়া লইয়াছে, এই আসল সত্যটি ঢাকাই রহিয়া গেল। পুঁজিপতি যে শুধু শ্রমিককে কম ঘণ্টা খাটাইয়া জীবনধারণের উপযোগী দৈনিক মজুরী হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে এমন নয়, শ্রমদিবসের নির্দিষ্ট ঘণ্টার অতিরিক্ত তাহাকে খাটাইয়া উপযুক্ত দর না'ও দিতে পারে। নির্দিষ্ট ঘণ্টার পরেও যদি তাহাকে অতিরিক্ত আরো তিন ঘণ্টা খাটানো হয়, অথচ তাহাকে প্রতিঘণ্টায় পূর্ব নির্দিষ্ট হারেই এই তিন ঘণ্টার জন্যও দেওয়া হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত সময় খাটুনির জন্য যে পরিমাণ শ্রমশক্তির অপচয় হইল তাহার উপযুক্ত মূল্য মোটেই দেওয়া হইল না।

প্রতিঘণ্টার হিসাবে শ্রমিককে মজুরী দেওয়ার রীতিতে পুঁজিপতির গুপ্ত অভিসন্ধি কার্যকরী হয়; সে দেখাইতে পারে শ্রমিককে যতখানি

খাটানো হইতেছে ততখানিই তাহাকে মজুরীও দেওয়া হইতেছে। পুঁজিপতির জন্য যেন কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত-মূল্য অবশিষ্ট থাকে না।

আরো এক প্রকারের মজুরী আছে, তাহার নাম পিস-মজুরী। দৈনিক কাজের পরিমাণ দেখিয়া তদনুযায়ী শ্রমিককে মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারের মজুরী টাইম-মজুরী ছাড়া অন্য কিছুই নয়। টাইম-মজুরীতে শ্রমের পরিমাণ মাপা হয়, যতখানি সময় কাজ করা হইয়াছে তাহাদ্বারা; পিস্-মজুরীতে শ্রমকে মাপা হয় একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে কত পরিমাণ দ্রব্য অর্থাৎ কতটি পিস্ তৈয়ারী করা হইয়াছে তাহা দ্বারা। স্থতরাং পিস্-মজুরীর ব্যাপারেও সময় দ্বারা শ্রম নিরূপণ রহিয়াছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি শ্রমশক্তির মূল্যের টাইম-মজুরী রূপটি অযৌক্তিক; ইহা মূল্য-উৎপাদনে শ্রমিক-পুঁজিপতির ভিতরে যে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাকে ঢাকিয়া রাখে। পিস্-মজুরী রূপটিও তাহাই করে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে 'ক' যখন 'খ' হইতে বেশী উৎপাদন করে এবং 'ক'কে 'খ' হইতে বেশী মজুরী দেওয়া হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রমিক যতখানি উৎপাদন করে ততখানিই তাহাকে দেওয়া হইতেছে। 'ক' নির্দিষ্ট সময়টিতে পূর্বের চাইতে আরো বেশী মজুরী উপার্জন করে; স্থতরাং শ্রমিক তাহার ন্যায্য পুজিপতির নিকট হইতে পাইতেছে। এই ভাবের ভ্রান্ত ধারণা পিস্-মজুরী হইতে আমাদের জন্মিতে পারে।

পিস্-মজুরী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির পক্ষে শ্রমিককে বেশী করিয়া শোষণের স্থবিধা হয়। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকের উপর নজর রাখিবার জন্য কড়া পাহারা ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয় না। কেননা শ্রমিক নিজের গরজেই বেশী করিয়া কাজ করিবে, পূর্ণ-মজুরী পাইতে হইলে

নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে নির্দিষ্ট সংখ্যার কাজ দিতে হইবে। বেশী কাজ দেখাইতে পারিলে বেশী মজুরীর সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া দিয়া শ্রমিক বেশী ঘণ্টা কাজ দিতে তৎপর হইবে।

পুঁজির সঞ্চয়

যে মূল্যটুকু পুঁজি হিসাবে কাজ করিতে যাইতেছে তাহার প্রথম কর্তব্য হয় উৎপাদনের উপকরণ এবং শ্রমশক্তিতে পরিবর্তিত হওয়া। এই ব্যাপারটি বাজারে পণ্যের চলাচলের ভিতরে সংঘটিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ কারখানায় উৎপাদনের উপকরণাদি নূতন দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যাপারটি সংঘটিত হয় উৎপাদনের ভিতরে বাজারের বাহিরে। যে মূল্য প্রথম পুঁজিপতি খাটাইয়াছে, তাহার চাইতে বেশী হইবে এই নূতন উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য। মূল্যের পরিমাণ যতখানি বেশী হইল, তাহাকে আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্য বলি। এই দ্রব্যাদি লইয়া পুঁজিপতিকে পুনরায় বাজারে আসিতে হইবে, এবার ক্রেতারূপে নয়, বিক্রেতা রূপে। ইহাদের বাজারে মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া পুনরায় সেই মুদ্রাকে পুঁজি হিসাবে খাটাইতে পারে; এই ভাবে পুনরায় পূর্বের মত চলিবে। এই বৃত্তাকার সঞ্চালনকে পুঁজির রূপ-পরিবর্তন বলা চলে।

সঞ্চয়ের জন্য প্রথম আবশ্যক হইল, পুঁজিপতিকে তাহার পণ্যাদি বিক্রয় করা চাইই। বিক্রয়লব্ধ মুদ্রাকে পুঁজি হিসাবে,—পূর্বের চাইতে বেশী পরিমাণ পুঁজি হিসাবে—খাটানো দরকার।

পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রথম হাত করিলেও একাই তাহা আত্মসাৎ করিতে পারে না। সমাজ-উৎপাদনে ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, ভূম্যাধিকারী প্রভৃতিরও অংশ আছে; উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টন ইহাদের সকলের ভিতরেই হয়। মুনাফা, স্থদ, ব্যবসায়িক-মুনাফা, খাজনা ইত্যাদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম। পুঁজি-সঞ্চয়ের বিচারে আমরা একমাত্র পুঁজিপতিকেই দেখিব, মনে করিয়া লইতে হইবে সবটুকু উদ্বৃত্ত-মূল্যই বুঝি সে-ই আত্মসাৎ করিয়া থাকে।

সমাজ উৎপাদনের রূপ যাহাই হউক না কেন, ইহাকে একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া হইতে হইবে। একই প্রকারের বিশিষ্ট স্তরগুলির ভিতর দিয়া বার বার যাইতে হইবে। সমাজ যেমন দ্রব্যাদি সম্ভোগ হইতে বিরত হইতে পারে না, তেমনি ইহাদের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন না করিয়া পারে না। তাই, যখনই আমরা সমাজ-উৎপাদনকে একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্র হিসাবে দেখি এবং ইহাকে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতে দেখি তখন আমরা সমাজ-উৎপাদনকে সামাজিক পুনরুৎপাদন-রূপে না দেখিয়া পারি না।

কোনও সমাজের পক্ষেই ক্রমিক উৎপাদন সম্ভবপর নয়, যদি না তাহা উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্যের একটি অংশকে নিরন্তর উৎপাদনের উপকরণাদিতে পরিবর্তিত করে। উৎপাদন পুঁজিতান্ত্রিক হইলে, পুনরুৎপাদনও পুঁজিতান্ত্রিক হইবে। এই বৎসর একশত পাউণ্ডকে পুঁজিতে রূপ দেওয়া হইয়াছে, কুড়ি পাউণ্ড উদ্বৃত্ত-মূল্য জাত হইয়াছে; ঠিক তাহাই পরের বৎসরগুলিতেও হইতে হইবে। উদ্বৃত্ত-মূল্য হয়ত বা পুঁজিপতি আপন সম্ভোগের জন্য খরচ করিয়া ফেলে, কিন্তু পূর্ব পুঁজির পরিমাণ বারবারই একই প্রকার থাকিতে হইবে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবখানিই পুঁজিপতি আপন প্রয়োজনে খরচ করিয়া ফেলিলে এবং একই পরিমাণের পুঁজি বারবার খাটিলে আমরা ইহাকে বলি ‘সরল পুনরুৎপাদন’।

উৎপাদন-প্রক্রিয়ার প্রথম সূচনা হয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রম-শক্তির ক্রয় দ্বারা। যখনই নির্দিষ্ট সময়টি অতিক্রান্ত হয়, তখনই শ্রম-শক্তি পুনরায় ক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু শ্রমিক যতক্ষণ না তাহার শ্রম-শক্তিকে খরচ করিয়া দ্রব্যোৎপাদন ও মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে, ততক্ষণ তাহার পারিশ্রমিক হইতে সে বঞ্চিত থাকে। শ্রমিক যে শুধু উদ্বৃত্ত-মূল্যই উৎপাদন করিয়াছে তাহা নয়, যে মূল্য দ্বারা তাহার মজুরী দেওয়া হইবে তাহাও তাহাকে পূর্বে উৎপাদন করিতে হইয়াছে। শ্রমিকের ততক্ষণই চাকুরী থাকিবে, যতক্ষণ সে ইহা পুনরুৎপাদন করিতে পারিবে। পুঁজিপতি অবশ্য মুদ্রায় মজুরী দিয়া থাকে, কিন্তু এই মুদ্রা শ্রমিকের উৎপাদিত দ্রব্যাদিরই পরিবর্তিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তাহার পূর্ব সপ্তাহের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত মূল্য হইতে চলতি সপ্তাহে তাহাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, পণ্যের উৎপাদন এবং চলাচল ভিন্ন মুদ্রায় পুঁজিতে পরিণত হওয়ার আরো একটি বিষয় আছে। একদিকে মুদ্রার মালিক অথবা উৎপাদনের উপকরণাদির মালিক এবং অন্যদিকে শুধু শ্রম-শক্তির মালিক—এই দু'য়ের পরস্পর সম্মুখীন হইতে হইবে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল কথাই হইল, শ্রম-শক্তির মালিককে শ্রমোৎপাদিত পণ্য এবং উৎপাদনের উপকরণাদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা। যাহা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের মূল, তাহাই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথায় ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক লোক দ্রব্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। শ্রমিককে শোষণ করিবার উপায় এইভাবে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পুঁজিতান্ত্রিক প্রথাকে একটি ধারাবহিক শ্রম-হিসাবে দেখিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ইহা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ছাড়া আর কিছু নয়; ইহা খালিই পণ্য প্রস্তুত করে না, খালিই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে না,

ইহা পুঁজিতান্ত্রিক-সম্বন্ধগুলিকেও সৃষ্টি ও পুনর্সৃষ্টি করে ; একদিকে পুঁজিপতি ও অন্যদিকে শ্রমিক—ইহাদের বিরোধ এই ধারাবাহিক উৎপাদন হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিভাবে পুঁজি হইতে উদ্বৃত্ত-মূল্য জাত হয় তাহা দেখিয়াছি ; এখন আমরা দেখিব কিভাবে পুঁজি উদ্বৃত্ত-মূল্য হইতে জাত হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যকে ভোগের জন্য না লাগাইয়া তাহাকে পুঁজিতে পরিণত করিয়া যদি উৎপাদনে খাটানো হয় তাহা হইলে ইহাকে বলা হয় পুঁজির সঞ্চয় (Accumulation of Capital)।

একজন সুতা প্রস্তুতকারী পুঁজিপতি মোট ১০ হাজার পাউণ্ড খাটাইয়াছে। ইহার $\frac{৪}{৫}$ অংশ খরচ হইয়াছে উৎপাদনের উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য, আর এক অংশ অর্থাৎ দুই হাজার পাউণ্ড খরচ হইয়াছে পরিবর্তমান পুঁজি হিসাবে। মোট সুতা প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইয়াছে ১২ হাজার পাউণ্ডের। শতকরা ১০০ যদি হয় শোষণের ডিগ্রী, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হয় ২০০০ পাউণ্ড।

এই অতিরিক্ত মুদ্রাকে যদি পুঁজি হিসাবে খাটানো হয়, তাহা হইলে আবার ইহার $\frac{৪}{৫}$ অংশ দ্বারা উৎপাদনের নূতন উপকরণাদি কিনিতে হইবে। ৪০০ পাউণ্ড খরচ হইবে পরিবর্তমান পুঁজি হিসাবে ; সুতরাং পূর্বেকার শোষণের ডিগ্রী অনুসারে নূতন উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হইবে ৪০০ পাউণ্ড।

পুঁজি সর্বপ্রথম খাটানো হইয়াছিল মুদ্রা হিসাবে। উদ্বৃত্ত-মূল্য কিন্তু সর্বপ্রথমই মুদ্রা নয়, ইহা মোট উৎপন্নের একটি বিশেষ অংশ। এই উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় হইলেই পুঁজি পুনরায় তাহার মুদ্রা-রূপ ফিরাইয়া পাইবে। এই মুদ্রা পুনরায় পরিণত হইবে উৎপাদনের উপকরণ ও শ্রম-শক্তিতে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যটিকে পুঁজি হিসাবে না খাটাইয়া যদি ভোগেই লাগানো

হয়, তাহা হইলে উৎপাদন সরল পুনরুৎপাদনের স্তরেই থাকিয়া যাইবে; উদ্বৃত্ত-মূল্যের কতকাংশ পূর্বেকার পুঁজির সহিত যদি সংযোগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উৎপাদনের আকার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে—এই ভাবের পুঁজির পরিবর্ধন এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রয়োগকে আমরা বলিয়া থাকি পুঁজির সঞ্চয়।

অধিক মাত্রায় যে এখন পুঁজি খাটানো হইবে তাহার জন্য প্রয়োজন অধিক শ্রম-শক্তি। আমাদের দৃষ্টান্তটিতে দেখিয়াছি, পুঁজি বৃদ্ধি পাইয়া বেশী বেশী উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। সেই পুরাতন কাহিনী। এব্রাহাম জন্ম দিল আইজাককে, আইজাক জন্ম দিল জেকবকে ইত্যাদি ইত্যাদি। মূল-পুঁজি দশহাজার পাউণ্ড, উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করিল হাজার পাউণ্ডের। ইহাকে এখন পুঁজি হিসাবে খাটানো হইল, উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হইল আরো ৪০০ পাউণ্ডের। এই ৪০০ পাউণ্ড খাটাইয়া পুঁজিপতি আরো ৮০ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত-মূল্য পাইতে পারে। এই ভাবে বলটি গড়াইয়াই চলিল। হইতে পারে, মূল পুঁজি পুঁজিপতি নিজে খাটিয়া উপার্জন ও সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য দ্বারা পুঁজির যে অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল তাহার অণুমাত্রও পুঁজিপতির খাটুনি-প্রসূত নয়। পুঁজি-বৃদ্ধির জন্য এখন যে অধিক শ্রম-শক্তিকে কিনিতে হইবে, তাহার জন্য মূল্য দেওয়া হইবে পূর্বতন শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত-মূল্য হইতে। পূর্ব বৎসর শ্রমিকশ্রেণী যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই ব্যবহৃত হইবে পর বৎসরের অতিরিক্ত শ্রমিকদের মজুরী হিসাবে।

ক্লাসিকেল পলিটিকেল ইকনমি ঠিকই বলিয়াছে, পুঁজির সঞ্চয় সম্ভব হইতে পারে উদ্বৃত্ত-দ্রব্যকে ভোগের জন্য খরচ না করিয়া যদি শ্রমিককে দেওয়া যায় তাহা কাজে লাগানোর জন্য, তবেই পুঁজির সঞ্চয় সম্ভব হইতে পারে। ক্লাসিকেল পলিটিকেল ইকনমির এই কথাটির ভিতর যেমন সত্য আছে তেমনি ভ্রান্তিও রহিয়াছে। এডাম স্মিথ বলেন, সঞ্চয়

অর্থই হইল শ্রমিক কর্তৃক ইহার প্রয়োগ; উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পুঁজিরূপে কাজে লাগানো অর্থই হইতেছে সমস্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যটি শ্রমিককে দেওয়া। কিন্তু ইহা কি কখনো হইতে পারে? মূল-পুঁজির মত উদ্বৃত্ত-মূল্যকেও দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়, একটি অংশ দ্বারা উৎপাদনের উপকরণাদি খরিদ করা চাই এবং অপর অংশটি দ্বারা ক্রয় করিতে হয় শ্রমিকের শ্রম-শক্তি। বুর্জোয়া ইকনমি পুঁজিপতি-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল সময়ই ইহাই বলে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটুকু পুঁজিপতি পুঁজি হিসাবে ব্যয় করে তাহার সবখানিই নাকি শ্রমিকদের মজুরী হিসাবেই খরচ করা হয়। এইভাবে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে দেখানো সম্ভব হয় যে শ্রমিকের স্বার্থ পুঁজিপতি শ্রেণী উপেক্ষা করে না।

সবখানি উদ্বৃত্ত-মূল্যই শুধু পুঁজিপতির ভোগে লাগিবে অথবা সবখানি পুঁজি হিসাবে খাটানো হইবে—এ'দুয়ের কোনটিই সত্য নয়। প্রকৃত পক্ষে ইহার একটি অংশ খরচ হয়, পুঁজিপতির ভোগের জন্য; অন্য অংশটি খাটানো হয় পুঁজি রূপে।

যে অংশটি মালিক পুঁজি হিসাবে খাটায় তাহাকে বলা চলে সঞ্চিত অংশ। পুঁজির প্রতিনিধি বলিয়াই পুঁজিপতির ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। সে যতক্ষণ পুঁজির প্রতিনিধি, ততক্ষণ তাহার লক্ষ্য থাকে পণ্যের ব্যবহার-মূল্য নয়, ইহার বিনিময়-মূল্য। মূল্য-বৃদ্ধিই তাহার একমাত্র কাম্য বলিয়া, সে শ্রমিক শ্রেণীকে উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন করিতে বাধ্য করে। এই ধরণের উৎপাদনে এখনকার সমাজে অপূর্ণতা ও বহুবিধ অসামঞ্জস্য থাকে বটে, কিন্তু ইহা আগামী সমাজের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখে—সে সমাজেই একমাত্র ব্যক্তির জীবন হইবে পূর্ণ বিকশিত। পুঁজিপতির ধনাকাঙ্ক্ষা ঠিক কৃপণের মতই; অনবরত পুঁজির মাত্রা না বাড়াইয়া তাহার পক্ষে উপায় নাই; পুঁজিতান্ত্রিক

উৎপাদনের বিকাশ এবং প্রতিযোগিতা হইতেই পুঁজির পরিসর ক্রমেই বাড়িতে থাকে। উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের বৃদ্ধি দ্বারাই ইহা সম্ভব।

সঞ্চয় মানেই হইল সমাজ-বিত্তকে ক্রমেই আয়ত্তের ভিতরে আনা। কিন্তু সর্বত্রই আদিম পাপ (original sin) আপন কাজ করিয়া যাইতেছে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার পরিমাণ বাড়িতে থাকে। আদি-পুরুষ এডামের প্রতি তাহার একটু হইলেও সহানুভূতি থাকিবেই। শিক্ষা-দীক্ষায় সে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, শরীরকে কষ্ট দিয়া সঞ্চয় করার প্রতি তাহার মন বিদ্রোহ করিয়া উঠে। পুঁজিতন্ত্রের বৃদ্ধি একটি বিশেষ মাত্রায় আসিয়া পৌঁছিলে মিতব্যয়িতার খানিকটা হানি ঘটিবেই—এই অমিতব্যয়িতা তাহার ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। পুঁজিপতি ধনবান হয় কৃপণের মত নয়। যত বেশী না খাইয়া বাঁচাইবে, তত বেশী কৃপণের বিত্ত বাড়িবে। কিন্তু পুঁজিপতি অধিক ধনী হইবে, যত বেশী শ্রমিককে সে শোষণ করিতে পারিবে এবং তাহাকে সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারিবে। মধ্যযুগের আভিজাতবর্গের মত সে অপরিণামদর্শী ও অমিতব্যয়ী না হইলেও পুঁজিপতির সঞ্চয়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে তাহার মুনাফার পরিমাণ যেমন বাড়ে, তেমনি তাহার খরচও বাড়িতে থাকে। খরচ বাড়ার জন্য যে তাহার সঞ্চয় সঙ্কুচিত হয় এমন নয়। কিন্তু যেমনই হউক, এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের বাসনা এবং সর্ন্তোগের ইচ্ছার ভিতরে তাহার মনে বিরোধ জাগিয়া উঠে।

সঞ্চয়ের জন্যই সঞ্চয় কর, উৎপাদনের জন্যই উৎপাদন কর—ইহাই হইল ক্লাসিকেল ইকনমি বর্ণিত বুর্জোয়াগণের একমাত্র সূত্র। প্রলিটেরিয়েট যদি হয় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের যন্ত্র, পুঁজিপতি অন্যদিকে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পুঁজিতে পরিণত করার জন্য একটি উপায় মাত্র।

সিনিয়র (Senior) আবিষ্কার করিলেন, পুঁজিরই অন্য নাম ভোগ

হইতে বিরতি (abstinence)। এই ভাবের উক্তি হইতে এই শ্রেণীর অর্থবিদরা প্রমাণ করিতে চায় যে, সঞ্চয় করার জন্য পুঁজিপতির দল সম্ভোগ হইতে বিরত হইতেছে। এই যে ত্যাগ ইহারই পুরস্কার মুনাফা। সম্ভোগ ত' দূরের কথা, শ্রমিককে সাধারণ জীবনধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদন হইতে বঞ্চিত রাখিয়া নিজেদের বিলাসের জন্য খরচবৃদ্ধিকে যদি ত্যাগ বলিতে হয় তাহা হইলে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু হয় কি ?

মূল্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পুঁজিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করি ; এক ভাগ অপরিবর্তমান পুঁজি অর্থাৎ যে মূল্য দ্বারা উৎপাদনের উপকরণাদি ক্রয় করা হয় ; অপর ভাগ, পরিবর্তমান পুঁজি অর্থাৎ মোট পুঁজির যে অংশ দ্বারা শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করা হয়। এই দু'য়ের পরস্পর অনুপাতই পুঁজির গড়নকে নির্ধারন করে। ইহাকে আমরা বলিব পুঁজির জৈবিক গড়ন (organic composition)।

ব্যক্তিগত পুঁজিগুলির বিভিন্নরূপ জৈবিক গড়ন থাকিতে পারে, কিন্তু একটি বিশেষ উৎপাদনে ব্যক্তিগত পুঁজিগুলির গড়নের বিভিন্নতা থাকিলেও এই বিশিষ্ট উৎপাদনের মোট পুঁজির একটি গড়পড়তা জৈবিক গড়ন রহিয়াছে। এই বিভিন্ন উৎপাদনগুলির আবার গড়পড়তা গড়নের আর একটি গড়পড়তা হিসাব করিয়া আমরা মোট সামাজিক পুঁজির জৈবিক গড়ন বাহির করিয়া লইতে পারি।

পুঁজির বৃদ্ধির সাথে সাথে পুঁজির পরিবর্তমান অংশ বাড়িতে থাকে। প্রতিবারের যতখানি উদ্বৃত্ত-মূল্যকে অতিরিক্ত পুঁজি হিসাবে খাটানো হয় তাহার একটি অংশদ্বারা প্রতিবারই শ্রমশক্তি খরিদ করিতেই হইবে। পুঁজি ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকিলে, একদিকে যেমন বেশী অথবা কমসংখ্যক বড় বড় পুঁজিপতি সৃষ্টি হইবে, অপরদিকে তেমনি বেশীসংখ্যক লোক শ্রমিক-জীবন যাপন করিয়া পুঁজির দাসত্ব গ্রহণ করিবে। পুঁজিবৃদ্ধির অর্থই হইল মজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি।

পুঁজিবৃদ্ধির একটি অবস্থায় দেখা যায়, শ্রমের উৎপাদনী-শক্তি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে। শ্রম-বিভাগের জটিলতা ও যন্ত্রপাতির উন্নতি হইতেই এই অবস্থাটি দেখা দেয়। উৎপাদনের উপকরণাদি অর্থাৎ পুঁজির অপরিবর্তমান অংশের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির অপর অংশটি অর্থাৎ পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ কমিতে থাকে। বস্তু-উপকরণ ও মনুষ্য-উপকরণের তারতম্য পুঁজিবৃদ্ধি এবং শ্রমের উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত না হইয়া পারে না। পূর্বে হয়ত পুঁজির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ খরচ হইত উৎপাদনের উপকরণাদির জন্য এবং বাকী শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শ্রম-শক্তির জন্য। শ্রমের উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় এখন প্রথমটির জন্য খরচ হইবে শতকরা আশী ভাগ, দ্বিতীয়টির জন্য বাকী কুড়ি ভাগ।

পুঁজিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তমান অংশের হারের আপেক্ষিক হ্রাস হইলেও পরিমাণের দিক হইতে ইহা পূর্বের তুলনায় অধিক হইতে পারে। পূর্বেকার মোট পুঁজির শতকরা পঞ্চাশ হইতে এখনকার মোট পুঁজির শতকরা কুড়ি; পরিমাণের দিক হইতে হয়ত বেশী। মোট পুঁজি ১০০ পাউণ্ড হইলে পূর্বের হিসাবে অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ এই হিসাবে শ্রমশক্তির জন্য খরচ হইবে ৫০ পাউণ্ড; এখন পুঁজি ৫০০ পাউণ্ড; শতকরা কুড়ি এই হিসাবে শ্রমশক্তির জন্য খরচ হইবে ১০০ পাউণ্ড। সুতরাং দেখা গেল, পরিবর্তমান পুঁজির হারের হ্রাস হইল বটে, কিন্তু পুঁজি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শ্রমের উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধির জন্য বৃহদায়তনে (on a large-scale) সমবায়ের প্রয়োজন। সমবায় সম্ভব হইতে পারে ব্যক্তিগত পুঁজিগুলির বৃদ্ধি দ্বারা। উৎপাদনের উপকরণাদি ও গ্রাসাচ্ছাদনের দ্রব্যাদি যতবেশী পুঁজিপতির আয়ত্তে আসিবে ততই পুঁজির কলেবর বৃদ্ধি হইবে এবং সমবায় সম্ভব হইতে পারিবে।

সামাজিক পুঁজি বহু হস্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলেও তাহার যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহাকে আমরা বলিব কেন্দ্রীভূক্তি (concentration) ; কিন্তু প্রতিযোগিতার ফলে অনেক পুঁজিপতি ধ্বংস হইলে, যখন এই পুঁজি অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে কেন্দ্রীকৃত হয় তখন তাহাকে আমরা বলিব সংকেন্দ্রন (centralisation)। বহু হস্তে পুঁজি ছড়াইয়া থাকে ; ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতায় বহু পুঁজিপতির ধ্বংস হইতে দ্বিতীয়টির জন্ম হয়।

প্রতিযোগিতার যুদ্ধ চালানো হয় দ্রব্যের মূল্যাদি কমাইয়া ; দ্রব্যাদির মূল্য কমানো নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদনী শক্তির উপর ; উৎপাদনী শক্তি বাড়িতে পারে পুঁজির বৃদ্ধি ও বৃহদাকারে সমবায়িক উৎপাদনের প্রবর্তন দ্বারা। তাই বড় বড় পুঁজি ছোট ছোট পুঁজিগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন একটি জিনিসের উদ্ভব হয়, ইহাকে আমরা বলিতে পারি ক্রেডিট-ব্যবস্থা। প্রথমত ইহা পুঁজিবৃদ্ধির ও সংকেন্দ্রনের সহায়ক হিসাবেই আবির্ভূত হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বড় বড় পুঁজিপতিদের কাজে লাগিয়া ক্রেডিট-ব্যবস্থা ছোট ছোট পুঁজিপতিদের সম্পর্কে মারাত্মক হইয়া উঠে। এখন আমরা দেখিতে পাই পুঁজিদার (Banker) ও পুঁজিপতি, উভয়ই মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক।

ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি হইল না ; যেগুলি নানাভাবে ছড়াইয়া ছিল, সেগুলিই কেন্দ্রীভূত ও একত্রিত হইল মাত্র ; মোট পরিমাণ বৃদ্ধি হইল না। কিন্তু কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমবায়িক উৎপাদনের আকার বর্ধিত হইল, তাহাতে পুঁজির বহুপরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার সুযোগ ঘটিল।

পুঁজির বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু তাহার ভিতরকার গড়নের ভিতরে একটি গুণগত পরিবর্তনও দেখা দিল। পুঁজির অপরিবর্তমান অংশ

ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, অন্যদিকে পরিবর্তমান অংশটির হার ক্রমেই কমিতে শুরু করিল। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির অনুপাত কি পরিমাণে হ্রাস হয়, তাহার একটি নিদর্শন উল্লেখ করিতেছি; প্রথম হয়ত বা ইহাদের অনুপাত ছিল একে এক, পরে পরে তাহা হইয়া দাঁড়াইল দুইএ এক, তিনে এক, চারে এক ইত্যাদি ইত্যাদি। পুঁজি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির জন্য আর অর্ধেক খরচ না হইয়া তিন-ভাগের একভাগ, চার-ভাগের একভাগ, পাঁচ-ভাগের একভাগ এই ভাবে ব্যয় হইতে লাগিল। যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য খরচ হইতে লাগিল তিনভাগের দুই ভাগ, চার-ভাগের তিনভাগ, পাঁচ-ভাগের চার ভাগ এই ভাবে। মোট পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবর্তমান অংশ বাড়ে বটে, কিন্তু পূর্বতুলনায় অল্প হারে। পুঁজিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রলিটেরিয়েটের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাছাড়া শ্রমিকশ্রেনীর জন-সংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে; ইহাদের তুলনায়, যে সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ পুঁজিবৃদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে বাড়ে তাহা নিতান্তই অল্প, সুতরাং শ্রমিকদের ভিতরে সকল সময়ই একটি অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় অংশ অবশিষ্ট থাকে, ইহাকে বলা চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা (Surplus Population) পুঁজিতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার এই অতিরিক্ত অংশ উত্তরোত্তর বাড়িবেই। এই জনসংখ্যামূলক সুত্রটিকে পুঁজিতন্ত্রের সহিত সম্পর্কিত করিয়াই দেখিতে হইবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রসূত ঘটনা হইলেও, ইহা আবার পুঁজিতন্ত্রের প্রসারেরও একটি হেতু। শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, পুঁজিপতিরা ইচ্ছামত তাহাদের কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরী কমাইয়া মুনাফা বাড়াইয়া লইতে পারে। তাহাছাড়া ইচ্ছামত কারখানার আয়তন বাড়াইতে হইলে ইচ্ছামত তাহারা শ্রমিকের

নিয়োগ বাড়াইতে পারে। এইভাবে শ্রমিক-সংখ্যার অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অংশ পুঁজিতন্ত্রের প্রসারের জন্য একেবারেই অপরিহার্য।

এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা তিনটি আকারে অবস্থিত রহিয়াছে। বেকার অথবা অর্ধ-নিযুক্ত শ্রমিক মাত্রই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে বড় বড় কারখানাগুলি অবস্থিত রহিয়াছে, সেখানে দেখা যায় কখনো বা 'শ্রমিক ছাটাই হইতেছে, আবার কখনো বা পূর্বের চাইতে বেশী-সংখ্যক শ্রমিক লওয়া হইতেছে। এইখানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ভাসমান (Floating) আকারে থাকে।

অনেকগুলি অটমেটিক কারখানায় দেখা যায়, পুঁজিপতিরা অল্প-বয়স্ক শ্রমিকদেরই সাধারণত নিযুক্ত করিয়া থাকে। যেই তাহারা সাবালক ও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া উঠে, অমনি তাহাদের কাজ হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয়; ইহারা এই ভাসমান বেকার সম্প্রদায়ের দল পুষ্ট করে। পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনে শ্রমশক্তি এত দ্রুত ক্ষয়-হয় যে জীবনের অর্ধেক বয়সেই শ্রমিকেরা অকর্মণ্য হইয়া বেকার-দল পুষ্ট করে। ইহাদের স্থান পূরণ করার জন্য মজুরদের অল্প বয়সেই বিবাহ করিতে হয়।

কৃষিকার্য পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়ার সাথে সাথে বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে। কারখানায় যেমন পুঁজিবৃদ্ধি হইলে বেশী-সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, কৃষিতে তেমন হয় না। তাই গ্রাম্য জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ সকলসময়ই শহর-অভিমুখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে; তাহাতে শহরে মজুরদের মজুরী হ্রাস পায়। গ্রামে সকলসময়ই 'অতিরিক্তসংখ্যার' সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে কৃষি-মজুরদের মজুরীও সর্বনিম্ন কোঠায় গিয়া পৌঁছে। এই প্রকারের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় অতিরিক্ত জনসংখ্যা (latent surplus-population)।

'এই অতিরিক্ত মজুর-জনসংখ্যার একটি অংশ অচটুল (stagnatn)।

এই অংশটি কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের পর্যায়ভুক্ত বটে, কিন্তু ইহাদের কাজ সকল সময় থাকে না ; পুঁজিপতির ইচ্ছামত ইহারা কাজ পাইতে পারে ; কারখানার মালিকের ইচ্ছার উপর ইহাদের নিয়োগ নির্ভর করে বলিয়াই ইহাদের অল্প মজুরীতে অধিকসময় খাটানোর সুবিধা হয়।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার সর্বনিম্নস্তর একেবারে দারিদ্রে (Pauperism-এ) বাস করে। ইহাদের আবার তিনটি শ্রেণী আছে। প্রথমতঃ যাহারা কার্যক্ষম। দ্বিতীয়তঃ পিতৃমাতৃহীন কাঙ্গাল শিশু-সন্তানেরা। তৃতীয়তঃ বয়োবৃদ্ধি এবং দুর্ঘটনাজনিত যাহারা কার্যে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পপার-ইজমকে বলা চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটি হাসপাতাল।

সমাজ-বিত্ত ও পুঁজি যতই বিস্তৃত ও বর্ধিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা যতই বাড়িবে, অতিরিক্ত মজুর-জনসংখ্যাও সেই পরিমাণে না বাড়িয়া পারে না।

মুনাফার হার ও সংকট ?

উদ্বৃত্তমূল্যের হার সম্পর্কে আমরা বিচার করিয়াছি। পুঁজিপতি যে মূলধন খাটাইয়াছে তাহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশের সহিত উদ্বৃত্তমূল্যের পরিমাণের অনুপাত করিয়া দেখিতে সে চায় না ; সে সমগ্র খাটানো মূলধনের সহিত তাহার উদ্বৃত্তমূল্যের অনুপাত করিয়া দেখিবে। এই অনুপাতকেই বলা হয় মুনাফার হার। অপরিবর্তমান

এবং পরিবর্তমান পুঁজির যোগফলই পুঁজিপতিকর্তৃক খাটানো সমগ্র পুঁজি; এই যোগফলকেই বলা যাইতে পারে পণ্যের খরচ! কিন্তু পণ্যের মূল্য সকল সময়ই পণ্যের খরচ হইতে অধিক। কেননা, পণ্যের খরচের সঙ্গে উদ্বৃত্তমূল্য যুক্ত হইয়াই পণ্যের মূল্য হইয়া থাকে। যদি ৪০০ পাউণ্ড হয় অপরিবর্তমান পুঁজি এবং ১০০ পাউণ্ড পরিবর্তমান পুঁজি এবং আরো ১০০ পাউণ্ড উদ্বৃত্তমূল্য (শোষণের হার ১০০% হইলে) তবে পণ্যের মোট মূল্য হইল ৬০০ পাউণ্ড। এই উদ্বৃত্তমূল্যই মুনাফা। এই মুনাফার মূল হইল এখানে যে পুঁজিপতি এমন একটি জিনিস বাজারে উপস্থিত করিয়াছে যাহার উৎপাদনের জন্য তাহাকে কিছুই খরচ করিতে হয় নাই। পণ্যের মূল্য হইতে পণ্যের খরচকে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই উদ্বৃত্তমূল্য অথবা মুনাফা। খাটানো সমগ্র পুঁজির সহিত এই উদ্বৃত্তমূল্যের অথবা মুনাফার অনুপাতকে $\frac{S}{C}$ এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

পুঁজিপতির সকলসময়ই লক্ষ্য থাকিবে পণ্যের বিক্রয়ের সময়ে তাহার বাজার-দর যেন পণ্যের খরচের উপরে থাকে। যদি এই খরচের নীচে বাজার-দর নামিয়া আসে তবে উৎপাদনের ভিতরে যাহা সে খাটাইয়াছে তাহাই উঠিবে না। এইরূপ অবস্থার জন্য পুঁজিপতি মনে করে পণ্যের-খরচই বুঝি পণ্যের ভিতরকার মূল্য। তাহার ধারণা, বাজারে অধিক যাহা কিছু সে লাভ করে তাহা বুঝি বিনিময় হইতেই উৎপাদিত হয়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পরিবর্তমান পুঁজির সহিত উদ্বৃত্তমূল্যের অনুপাতকে বলা হয় উদ্বৃত্তমূল্যের হার। এই উদ্বৃত্তমূল্যের হারকে $\frac{S}{V}$ রূপে প্রকাশ করা হয়। একই পরিমাণকে দুই ভাবে অনুপাত

করার জন্য দুইটি বিভিন্ন ফল দেখা দিয়াছে। উদ্বৃত্তমূল্যেরই বাহ্যিক রূপ মুনাফা এবং মুনাফার হারই বাহিরে প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু অদৃশ্যভাবে থাকিলেও উদ্বৃত্তমূল্যের হারই যথার্থ সারবস্তু।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে মুনাফার হার এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের হার, এই দু'য়ের সংখ্যাত্মক প্রভেদ থাকিলেও মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য কিন্তু একই। মুনাফা উদ্বৃত্তমূল্যেরই পরিবর্তিত রূপ; এই পরিবর্তিত রূপটি কোথা হইতে, কি উপায়ে যে উদ্বৃত্তমূল্য উৎপাদিত হয় তাহাকে আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখে। সুতরাং উদ্বৃত্তমূল্যের আসল স্বরূপ বুঝিতে হইলে মুনাফা-রূপ আবরণটিকে সরাইয়া লইতে হইবে। উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভিতরেই আমরা পুঁজি এবং শ্রমের যথার্থ সম্পর্কটিকে পাই। কিন্তু পুঁজি-মুনাফার পরস্পর সম্পর্কের ভিতরে বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই, ইহা যেন পুঁজিরই নিজের সহিত নিজের সম্পর্ক। পুঁজিপতি উৎপাদনে যে পুঁজি খাটাইয়াছে, বাজারে পণ্য বিক্রয় করিয়া যে লভ্যাংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাই মুনাফা; খাটানো পুঁজির বর্ধিতাংশ, লভ্যাংশকে উদ্বৃত্তমূল্য-রূপে না দেখিয়া মুনাফা-রূপে যখন দেখা হয় তখনই আসল সত্যটিকে রহস্যাবৃত করিয়া রাখা হয় মাত্র।

উদ্বৃত্তমূল্য অথবা মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে তিনটি জিনিসের উপরে: (১) শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্য; (২) শ্রমের গাঢ়তা, (৩) মজুরী। মজুরী যদি বাড়ে, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত-মূল্য কমিবে। কিন্তু অপর দুইটি যদি বাড়ে তাহা হইলে উদ্বৃত্তমূল্য বাড়িবে। ধরা যাউক যেন মোট পুঁজি ১০০; শোষণের হার ১০০; অপরিবর্তমান পুঁজি ৮০ এবং পরিবর্তমান পুঁজি ২০। তাহা হইলে উদ্বৃত্তমূল্য হইল ২০। ইহাকে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ৮০C+২০V+২০S —এইখানে উদ্বৃত্তমূল্যের হার ১০০%, মুনাফার হার ২০%।

শ্রমদিবস পূর্বে ছিল ১০ ঘণ্টা, এখন যদি ইহাকে পনর ঘণ্টায় বাড়ানো যায় এবং মজুরী পূর্বের মতই থাকে, তাহা হইলে পূর্বের ২০ জন শ্রমিক এখন মোট মূল্য উৎপাদন করিবে ৪০-এর জায়গায় ৬০। মজুরী যেহেতু পূর্বের মতই রহিয়াছে, উদ্বৃত্তমূল্যের অংশ এখন পূর্বের কুড়ির জায়গায় হইবে ৪০। সুতরাং শোষণের হার এখন হইয়াছে ২০০% এবং মুনাফার হার ৪০%। শ্রমদিবস যদি ১০ ঘণ্টাই থাকে এবং মজুরী কমিয়া ২০-এর জায়গায় ১২, তবে মোট মূল্য এখন উৎপাদিত হইবে ৪০-ই বটে, কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূলের অংশ হইবে ২৮। এই ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার হইল ২৩৩$\frac{১}{৩}$% এবং মুনাফার হার হইল ৩০$\frac{১০}{১৩}$%।

তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রমদিবসের বৃদ্ধি, শ্রমের গাঢ়তার বৃদ্ধি এবং মজুরীর হ্রাস উদ্বৃত্তমূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই অবস্থাটি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে এই তিনটির পরিবর্তন পরিবর্তমান পুঁজি (V) এবং উদ্বৃত্তমূল্যের (S), এই দু'য়ের এবং উহাদের অনুপাতের পরিবর্তন না ঘটাইয়াই পারে না। এই পরিবর্তনের সঙ্গে মুনাফার হার অর্থাৎ মোট পুঁজির সহিত উদ্বৃত্তমূল্যের অনুপাতের ভিতরেও পরিবর্তন সংঘটিত না হইয়াই পারিবে না। একসঙ্গে সমস্ত পুঁজি খাটানো সম্ভব নয়। কেননা সমস্ত পুঁজি খাটাইয়া উৎপাদন হয়ত বা করা গেল। কিন্তু উৎপাদিত-দ্রব্য বাজারে বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় উৎপাদন কার্য শুরু করা সম্ভব হইয়া উঠে না; তাই কিছুটা পুঁজি হাতে রাখিয়া যতখানি পুঁজি খাটাইলে শীঘ্র শীঘ্র উৎপাদিত-দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে, ততখানিই খাটানো হয়। বাজারে উৎপাদিত-দ্রব্য বিক্রয় হইয়া পুনরায় পুঁজির উৎপাদনে প্রত্যাবর্তনকে বলা হয় 'টার্ণ-ওভার'। এই প্রত্যাবর্তনের সময় যত অল্প হয়, ততই পুঁজি হাতে পড়িয়া থাকিবে কম; উদ্বৃত্তমূল্যও লাভ হইবে অধিক। উৎপাদন এবং বিক্রয় যত শীঘ্র হইবে, বৎসরে পুঁজির প্রত্যাবর্তনও অধিক

হইবে। উৎপাদনের সময় কমিতে পারে, শ্রমের উৎপাদনী-শক্তি বৃদ্ধির জন্য ; এই অবস্থাটিকেই বলা হয় শিল্পের উন্নয়ন। বিক্রয়ের সময় হ্রাস পাইতে পারে উন্নততর যানবাহনের প্রচলনের জন্য।

এখন দেখা যাউক, অল্প সময়ে উৎপাদন এবং বিক্রয়ের জন্য অর্থাৎ পুঁজির অধিক প্রত্যাবর্তন (turn-over) হেতু কি করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি হয়। মোট পুঁজি ধরা যাউক ১০০ ; C=৮০ ; V=২০ ; উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ১০০%। প্রতি বৎসরে এই পুঁজি প্রত্যাবৃত হয় দুইবার ; অর্থাৎ টার্ণ-ওভার ২। পুঁজি বৎসরে দুইবার কাজ করিলে ৮০C+২০V+২০S-এর জায়গায় মোট পণ্যের মূল্য হইবে ১৬০C+৪০V+৪০S। এই ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারণ করিতে গিয়া আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্য ৪০কে ২০০র (১৬০C+৪০V) সহিত অনুপাত করিব না ; ইহার অনুপাত হইবে আসল পুঁজি ৮০C+২০V=১০০র সহিত, এই অবস্থায় মুনাফার হার হইল ৪০ %।

ধরা যাউক, আসল পুঁজিই ১৬০C+৪০V এবং ১০০ পার্শেণ্ট উদ্বৃত্ত মূল্যের হার অনুসারে উদ্বৃত্তমূল্য ৪০। বাৎসরিক প্রত্যাবর্তন যদি হয় মাত্র এক, তাহা হইলে মুনাফার হার হইল $\frac{80}{200}$ × ১০০ = ২০ পার্শেণ্ট।

সুতরাং দেখা গেল যে, দুইটি পুঁজির অপরিবর্তমান এবং পরিবর্তমান অংশের অনুপাত (organic Composition) যদি একই হয়, শোষণের হার যদি সমান হয়, শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্যও যদি এক হয়; দুইটি পুঁজির মুনাফার হারের ব্যতিক্রম হইবে, তাদের 'টার্ণ-ওভার' অনুসারে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে পাঁচ শত পাউণ্ডের পরিবর্তমান পুঁজি বৎসরে দশবার ঘুরিয়া আসিলে তাহা হইতে যে মুনাফা সৃষ্টি হইবে তাহা বৎসরে একটি 'টার্ণ-ওভার'-বিশিষ্ট পাঁচ হাজার পাউণ্ডের পুঁজির মুনাফার সমান। ধরা যাউক, একটি মোট পুঁজির যে অংশটি যন্ত্রপাতি তাহার পরিমাণ ১০,০০০ ; ইহার বাৎসরিক ক্ষয়ের (wear and tear) হার শতকরা ১০। অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশটি—কাঁচা-মাল ইত্যাদি, তাহার পরিমাণ ৫০০; পরিবর্তমান পুঁজি ৫০০। উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার শতকরা ১০০। সহজে বোধগম্য হইবার জন্য ধরা যাউক যেন পরিবর্তমান পুঁজি যে-সময়ে এবং যতবার প্রত্যাবৃত হয়, সেই সময়ে অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশটি কাঁচমাল তাহাও ততবারই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই অবস্থায় একটি প্রত্যাবর্তনে যে মোটফল দেখা দিবে তাহা নিম্নোক্তরূপ।

১০০C (ক্ষয়াংশ)+৫০০C+৫০০V+৫০০S=১,৬০০। বাৎসরিক 'টার্ণ-ওভার' যদি হয় দশ, তবে মোটফল হইবে ১,০০০C (ক্ষয়াংশ) +৫,০০০C+৫০০০V+৫,০০০S=১৬,০০০। এই ক্ষেত্রে মোট C+V হইল ১০০০C+৫০০০C+৫০০০V=১১,০০০; S=৫০০০; সুতরাং মুনাফার হার (P)=$\frac{৫০০০}{১১০০০}$=৪৫$\frac{৫}{১১}$%।

সমগ্র পুঁজির ভিতরে অপরিবর্তমান পুঁজির অংশই অধিক; সুতরাং অপরিবর্তমান পুঁজি অথবা C যতই বাড়িবে মুনাফার হার কমিবে। অবশ্য ইহাও সত্য যে অপরিবর্তমান পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তমান পুঁজিও বাড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্তমূল্যের পরিমাণও বাড়িবে। তাই পুঁজিপতির সকল সময়ই চেষ্টা থাকে যাহাতে অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্য কমানো সম্ভব হইতে পারে। পুঁজিপতির প্রথম চেষ্টা থাকে, শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া দেওয়া। তাহা হইলে পূর্বের একই সংখ্যক শ্রমিক একই যন্ত্রপাতি দ্বারা অধিক উদ্বৃত্তমূল্য উৎপাদন করিবে। অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইল না, যন্ত্রপাতি এবং বাড়ীঘরও বাড়াইতে হইল না। শ্রমিককে অতিরিক্ত খাটুনির জন্য অতিরিক্ত মজুরীও যদি দেওয়া হয়, তথাপি পুঁজিপতির কোন ক্ষতি নাই; কেননা, অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদন সম্ভব হইল, অথচ অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশটি যন্ত্রপাতি এবং বাড়ী-ঘর তাহা পূর্বের মতই রহিয়া গেল।

শ্রম-দিবস যদি বাড়ানো সম্ভব না হয়, তখন কি হইবে? শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইলে, যন্ত্রপাতিও বাড়াইতে হইবে, অথবা ভাল যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া শ্রমিকের উৎপাদনীশক্তি বৃদ্ধি দ্বারা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যেমনি হউক, অপরিবর্তমান পুঁজির যে-অংশ যন্ত্রপাতি এবং যে-অংশ কাঁচামাল—দুইই বাড়ানো প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থায় মুনাফার হার কমিবেই। তখনই পুঁজিপতি চেষ্টা করিবে নানা-উপায়ে ব্যয়-সংকোচন দ্বারা অপরিবর্তমান পুঁজির মূল্য কমাইয়া লইতে; কিন্তু এইরূপ ব্যয়সংকোচন করিতে গিয়া শ্রমিকের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে তাহার মোটেই বাধে না। সংকীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বহু শ্রমিককে একসঙ্গে কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহারই একপাশে হয়ত বা মারাত্মক একটি যন্ত্র স্থাপন করা হইল। ইহাকে পৃথক ঘরে রাখিয়া শ্রমিকের জীবনকে নিরাপদ রাখিবার দিকে মোটেই দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন সে বোধ করে না।

ধরা যাউক যেন ক এবং খ দুইটি বিভিন্ন প্রকারের উপাদান। দুইটিরই মোট পুঁজি ৭০০। ক'য়ে পরিবর্তমান পুঁজি (v) ১০০; সুতরাং অপরিবর্তমান পুঁজি (c) ৬০০। খ'য়ে পরিবর্তমান পুঁজি ৬০০; সুতরাং অপরিবর্তমান পুঁজি সেখানে ১০০। শোষণের হার যদি দুইটিতেই ১০০% হয় তবে প্রথমটিতে উদ্বৃত্তমূল্য হইবে ১০০, দ্বিতীয়টিতে ৬০০। এই অবস্থায় ক'য়ে মুনাফার হার $\frac{১০০}{৭০০}=\frac{১}{৭}=১৪\frac{২}{৭}$%; খ'য়ে মুনাফার $\frac{৬০০}{৭০০}=\frac{৬}{৭}=৮৫\frac{৫}{৭}$%। এই দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সকল উৎপাদনে 'অর্গেনিক কম্পোজিসন' কম সেখানে মুনাফার হার বেশী, যেখানে 'অর্গেনিক কম্পোজিসন বেশী, মুনাফার হার সেখানে কম। ক'য়ে অপরিবর্তমান পুঁজির সহিত পরিবর্তমান পুঁজির অনুপাত ১০০ ঃ ৬০০ = ১ ঃ ৬; খ'য়ে এই অনুপাত ৬০০ ঃ ১০০

=৬ঃ১। তাহা হইলে দেখা গেল যে, 'অর্গেনিক কম্পোজিসনের' বিভিন্নতার জন্যই একই পরিমাণের পুঁজি বিভিন্ন উৎপাদনে বিভিন্ন মুনাফার হার সৃষ্টি করিয়াছে। একই পরিমাণের দুইটি পুঁজি একই পরিমাণের সৃষ্টি করিবে যখন শুধু ইহাদের 'অর্গেনিক কম্পোজিসন' সমান হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে, 'অর্গেনিক কম্পোজিসনের' তারতম্য সত্ত্বেও যদি মোট পুঁজি সমান হয়, তবে দুইটি উৎপাদনের মুনাফা এবং মুনাফার হার বিভিন্ন হইবে বটে কিন্তু উৎপাদনের খরচ (Cost price) একই হইবে। ৯০C+১০V অথবা ১০C+৯০V এই দুই ক্ষেত্রেই পণ্য তৈয়ারীর খরচা একই ; দুইক্ষেত্রেই ইহার পরিমাণ ১০০। এই সমতাই হইল পুঁজিতে পুঁজিতে প্রতিযোগিতার ভিত্তি, ইহা হইতেই সৃষ্টি হয় গড়পড়তা-মুনাফার হার (average rate of Profit)।

পাঁচটি বিভিন্ন উৎপাদনের দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। প্রত্যেকটির পুঁজিরই 'অর্গেনিক কম্পোজিসন' বিভিন্ন।

পুঁজি	উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার	উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ	দ্রব্যের মূল্য	মুনাফার হার
(১) ৮০C+২০V	১০০%	২০	১২০	২০%
(২) ৭০C+৩০V	১০০%	৩০	১৩০	৩০%
(৩) ৬০C+৪০V	১০০%	৪০	১৪০	৪০%
(৪) ৮৫C+১৫V	১০০%	১৫	১১৫	১৫%
(৫) ৯৫C+৫V	১০০%	৫	১০৫	৫%

উপরের পাচটি পুঁজির উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার এক হইলেও, তাহাদের 'অর্গেনিক কম্পোজিসনের' বিভিন্নতার জন্য মুনাফার হারও বিভিন্ন

হইয়াছে। পাঁচটি পুঁজির যোগফল ৫০০; উদ্বৃত্ত-মূল্যের যোগফল ১১০; উৎপাদিত দ্রব্যের মোট মূল্য ৬১০। এই ৫০০-কে যদি আমরা একটি পুঁজি হিসাবেই দেখি, তাহা হইলে ইহার গড়পড়তা গড়ন হইবে ৩৯০C+১১০V; শতকরা হিসাবে দেখিলে তাহা দাঁড়ায় ৭৮C+২২V। অর্থাৎ যদি প্রত্যেক একশতকে পাঁচ-শতের এক-পঞ্চমাংশ হিসাবে ধরা যায় তবে প্রত্যেকটির গড়পড়তা গড়ন হইল ৭৮C+২২V; তাহা হইলে প্রত্যেক একশ'য় গড়পড়তা মুনাফার হার হইবে ২২%। তাছাড়া, মোট উৎপাদিত-দ্রব্যের প্রত্যেক পঞ্চমাংশের বাজার-দর হইবে ১২২।

পুঁজি	উদ্বৃত্ত মূল্যের হার	উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ	মুনাফার হার	অপরিবর্তমান পুঁজির যে অংশ খরচ হইয়াছে (used-up)	উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য value of commodities	উৎপাদনের খরচ Cost-price
১) ৮০C+২০V	১০০%	২০	২০%	৫০	৯০	৭০
২) ৭০C+৩০V	১০০%	৩০	৩০%	৫১	১১১	৮১
৩) ৬০C+৪০V	১০০%	৪০	৪০%	৫১	১৩১	৯১
৪) ৮৫C+১৫V	১০০%	১৫	১৫%	৪০	৭০	৫৫
৫) ৯৫C+৫V	১০০%	৫	৫%	১০	২০	১৫
৩৯০C+১১০V		১১০	১০০%			
৭৮C+২২V		২২	২২%			

উপরের লেখ্যটিতে আমরা উৎপাদনের খরচের একটি ঘর দেখাইয়াছি।—ইহার প্রত্যেকটির সহিত গড়পড়তা উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ ২২ যোগ করিলেই আমরা পাইব উৎপাদনের বাজার-দর (Price of production).

পুঁজি	উদ্বৃত্ত মূল্য	দর	উৎপাদনের খরচ (cost-price of commodities)	দ্রব্যের বাজার দর (price of commo)	মুনাফার হার	মূল্য হইতে বাজার-দরের বিচ্যুতি Deviation of price from value
১) ৮০C+২০V	২০	৯০	৭০	৯২	২২%	+২
২) ৭০C+৩০V	৩০	১১১	৮১	১০৩	২২%	—৮
৩) ৬০C+৪০V	৪০	১৩১	৯১	১১৩	২২%	—১৮
৪) ৮৫C+১৫V	১৫	৭০	৫৫	৭৭	২২%	+৭
৫) ৯৫C+৫V	৫	২০	১৫	৩৭	২২%	+১৭

এইখানে একটি বিষয় বিবেচ্য। আমরা পূর্বের দৃষ্টান্তে ধরিয়া লইয়াছি যে অপরিবর্তমান পুঁজির সকলটুকুই একটি টার্ণ-ওভারেই নিঃশেষিত হয়। কোন কোন সময়ে তাহা সম্ভব হইলেও, যেখানে অপরিবর্তমান পুঁজি পরিবর্তমান পুঁজি হইতে বহু গুণ বড়, সেখানে যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরেই ক্ষয় হইবে।

এই বিচ্যুতির হিসাব লইলে দেখা যায় যে উৎপাদিত দ্রব্যগুলি একক্ষেত্রে মূল্যের ২+৭+১৭=২৬ উপরে বিক্রয় হইয়াছে, অপরক্ষেত্রে ৪+১৮=২৬ নীচে বিক্রয় হইয়াছে। বাজার-দর একক্ষেত্রে যতখানি

মূল্যের উপরে গিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে ততখানি নীচে নামিয়াছে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি পুঁজি হইতে যে মূল্য সৃষ্টি হইয়াছিল বাজারে তাহাই উঠাইয়া লওয়া গেল। এই বিচার হইতে দেখা গেল, দ্রব্যের বাজার-দর দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ এবং গড়পড়তা মুনাফার সমষ্টির সমান।

বিভিন্ন উৎপাদনের পৃথক পৃথক মুনাফার হারকে গড়পড়তা মুনাফার হার দ্বারা প্রতিযোগিতা সমান করিয়া দেয়। কোন পুঁজিই তাহার নিজের উৎপাদনের ভিতরে যে উদ্বৃত্তমূল্য অথবা মুনাফা সৃষ্টি হয় তাহাই আত্মসাৎ করিতে পারে না। সমাজের সকল পুঁজি খাটাইয়া পুঁজিপতিরা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য অথবা মুনাফা সৃষ্টি করে তাহারই একটি অংশ সমাজের মোট পুঁজির প্রতি শতাংশের ভাগে পড়ে। 'অর্গেনিক কম্পোজিসন' যাহাই হউক, যে-কোন উৎপাদনেই যে-পরিমাণ পুঁজিই খাটিয়াছে তাহার প্রতি শতাংশের মুনাফার হার একই হইবে। পুঁজিপতিরা যেন একটি ষ্টক-কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার; প্রতি শেয়ারের মূল্য একশত; যাহার বেশী শেয়ার তাহার ভাগে পড়ে তত বেশী পরিমাণ মুনাফা। মুনাফার হারের ব্যতিক্রম হইতেছে না, যে যত বেশী পুঁজি খাটাইয়াছে তাহার সেই অনুপাতে মাত্র বেশী মুনাফা লাভ হইতেছে। প্রত্যেক মালিকেরই উৎপাদনের খরচ তাহার নিজের; কিন্তু এই খরচের সহিত যে মুনাফা যুক্ত হইতেছে তাহার উদ্ভব সম্পূর্ণই সামাজিক। উৎপাদনে যে মুনাফা সৃষ্ট হয়, এই মুনাফা তাহা নয়। দশরকম পুঁজির মুনাফার গড়পড়তা হিসাব লইয়াই এই মুনাফার সন্ধান পাওয়া যায়। এই মুনাফা মোট খাটানো পুঁজির প্রত্যেক শতাংশের একটি গড়পড়তা পরিমাণ।

সাধারণ ধারণা, যে-উৎপাদনে অপরিবর্তমান পুঁজির (C) পরিমাণ অধিক হয়, তাহারই মুনাফা অধিক হইতে হইবে। কিন্তু আমাদের

বিচারে পরিষ্কারই দেখা গেল যে, এইরূপ উৎপাদনে পরিবর্তমান পুঁজির (V) অংশ কম বলিয়া মুনাফাও এইখানে কম। উপরোক্ত লেখ্যগুলিতে যে উৎপাদনগুলির 'অর্গেনিক কম্পোজিসন' উচ্চ, সেগুলিতে মুনাফা কম। কিন্তু গড়পড়তা হিসাব কষিয়া দেখা গেল যে দ্রব্যের বাজার-দর যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মুনাফার হার এইগুলিতেই আপন-আপন উৎপাদনের ভিতরে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং মুনাফার হার হইতে অধিক। উপরোক্ত লেখ্যগুলির (৫) পুঁজিতে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র ৫; অথচ গড়পড়তা হিসাব কষিয়া দেখা গেল বাজার-দর যাহা হইয়াছে তাহাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য ২২। বিভিন্ন উৎপাদনের ভিতরে 'অর্গেনিক কম্পোজিসন' যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক শতাংশ পুঁজির লভ্যাংশের হার সমান হইতে হইবে।

একটি বিশেষ প্রকারের উৎপাদনের ভিতরে বিভিন্ন পুঁজির উৎপাদিত দ্রব্যগুলির মূল্য যাহাই হউক না কেন, তাহাদের বাজারদর নির্ধারিত হইবে সমাজ নির্ধারিত শ্রমসময় দ্বারা। আবার বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের ভিতরে পুঁজির প্রতিযোগিতা উৎপাদনের বাজার-দর ঠিক করিয়া তাহাদের ভাগে সমান মুনাফার হার নির্ধারিত করিয়া দিবে। উৎপাদনের বাজার-দর কি করিয়া ঠিক হয়, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। উৎপাদনের খরচার সহিত গড়পড়তা মুনাফা যোগ দিলেই আমরা উৎপাদনের বাজার-দর পাইয়া থাকি।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যন্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির পরিমাণ খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। এই মোট পুঁজির ভিতরে আবার যে অংশ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তাহাদের বৃদ্ধি হইতেছে বেশী। পরিবর্তমান পুঁজিও (V) ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ বাড়িলেও পরিবর্তমান পুঁজির বৃদ্ধির অনুপাতে পরিবর্তমান পুঁজি কম বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে হয়ত বা পরিবর্তমান পুঁজি ছিল

৪০ ; এখন মোট পুঁজি দ্বিগুণ বৃদ্ধি হওয়ার জন্য পরিবর্তমান পুঁজি ১০০ হইল, কিন্তু অপরিবর্তমান পুঁজি পূর্বে ৬০-এর জায়গায় হইল ১০০। এই ক্ষেত্রে অপরিবর্তমান পুঁজি দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ বাড়িলেও তাহার বৃদ্ধি দ্বিগুণ হয় নাই। ৬০c+৪০v এ (শোষণের হার ১০০%) মুনাফার হার হইল ৪০% ; কিন্তু ১৩০c+৭০v-এ মুনাফার হার হইয়াছে ৩৫%। এই বিচার হইতে পরিষ্কারই দেখা গেল শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তমান পুঁজির বৃদ্ধি হইলে, পরিবর্তমান পুঁজির মোট পরিমাণ বাড়িলেও তাহার আপেক্ষিক হ্রাসের জন্য মুনাফার হার কমিয়া যায়।

এই সূত্রটি এত সহজ হইলেও অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহার কারণ উদ্ধার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। C : V=৫০ : ১০০ হইলে শোষণের হার (১০০%) ৬৬⅔% মুনাফার হারের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় ; অথচ c : v=৪০০ : ১০০ হইলে একই শোষণের হার ২০% মুনাফার হারে প্রকাশিত হইল।

পরিবর্তমান পুঁজির আপেক্ষিক হ্রাস এবং অপরিবর্তমান পুঁজির আপেক্ষিক বৃদ্ধিতে বর্ধিত উৎপাদনশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। একটির আপেক্ষিক বৃদ্ধি এবং অপরটির আপেক্ষিক হ্রাস হইলেও দুয়েরই মোট পরিমাণের বৃদ্ধি হয়।

উপরোক্ত বিচারে দেখা গেল যে, আপেক্ষিক হ্রাস হইলেও পরিবর্তমান পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হার কমিতেছে বটে কিন্তু মুনাফার পরিমাণ বাড়িতেছে। এই বৃদ্ধির দরুণ পুঁজিপতির হাতে পুঁজির সঞ্চয় (Accumulation) উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। মুনাফার হার কমিতেছে দেখিয়া সকল পুঁজিপতিই তখন চেষ্টা করিবে অধিকতর পুঁজি খাটাইয়া মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা

ক্ষতি পুরাইয়া লইতে ; অধিক পুঁজি খাটানোর জন্য পূর্ব অপেক্ষা অধিক শ্রমিক এখন নিযুক্ত হইবে বটে কিন্তু এই বৃদ্ধির হার অপরিবর্তমান পুঁজির বৃদ্ধির হার হইতে অপেক্ষাকৃত কম। এই অবস্থাটিতে একটি আপেক্ষিক অতিরিক্ত জনসংখ্যার (relative surplus population) সৃষ্টি হয়। পরিবর্তমান পুঁজি যদি অধিক না হইয়া মোট পুঁজির একষষ্ঠাংশ হয় তাহা হইলে পূর্বের শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করিতে হইলে মোট পুঁজিকে আরো দ্বিগুণ বাড়াইতে হইবে। শ্রমশক্তি যদি দ্বিগুণ করা যায় তবে মোট পুঁজি আরো ছয়গুণ বাড়াইতে হইবে ; সুতরাং মোট পুঁজি এবং ইহার অপরিবর্তমান অংশ যে হারে বৃদ্ধি পায়, পরিবর্তমান পুঁজি অথবা শ্রমশক্তি সেই অনুপাতে বাড়িতে পারে না।

মুনাফার হার যে ক্রমেই কমিতেছে এই সমস্যাটির সমাধান মার্কস ছাড়া অন্য কোন অর্থনীতিজ্ঞ করিতে পারেন নাই। মুনাফার হার কমিয়া একেবারেই তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে না কেন, এই সমস্যার একমাত্র মার্কসই সমাধান করিয়াছেন। মুনাফার হার কমিতেছে দেখিয়া পুঁজিপতিরা ইহার নিম্নাভিমুখী গতিকে ঠেকাইতে চেষ্টা করেন। তাহাদের প্রথম চেষ্টা শোষণের হার বৃদ্ধি করা, তবে মুনাফার পরিমাণ কতকটা বাড়িতে পারে। এই শোষণের হার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে দুই উপায়ে ; শ্রমদিবসের দৈর্ঘ্য বাড়ানো ; শ্রমের গাঢ়তা বৃদ্ধির দ্বারা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্জন। উদ্বৃত্ত-মূল্যের অথবা মুনাফার পরিমাণ যতই বাড়ানো সম্ভব হইবে ততই মুনাফার হারের নিম্নাভিমুখী গতিকে খানিকটা ঠেকানো যাইতে পারে। শ্রমশক্তির যথার্থ মূল্যের নীচে মজুরী দিয়াও মুনাফা বৃদ্ধি করা যইতে প্যারে। তাছাড়া শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তমান পুঁজির আয়তন (volume) যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার মূল্য সেরূপ বাড়ে না। শিল্পের উন্নতির

সঙ্গে সঙ্গে সকল জিনিসেরই মূল্য কমে ; সেই হিসাবে অপরিবর্তমান পুঁজিরও মূল্য কমিতেছে। শিল্পে অপরিবর্তমান পুঁজির অংশ দ্রুত বাড়িয়া যাওয়ার জন্য কি ভাবে যে অতিরিক্ত-বেকার-জনসংখ্যার সৃষ্টি হইতেছে পূর্বেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। জনসংখ্যার বাহুল্যের জন্য এই সময়ে নূতন নূতন উৎপাদন দেখা দেয়। এই উৎপাদনগুলি গোড়ায় অল্প মজুরীতে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। এক-কথায় অপরিবর্তমান (C) হইতে পরিবর্তমান পুঁজির (V) অংশই এই সকল উৎপাদনে বেশী থাকে। এই কারণে, এই সকল উৎপাদনে মুনাফার হার অধিক। কিন্তু গড়পড়তা মুনাফার হার ঠিক হয় সকল উৎপাদনগুলিকে এক করিয়া। কতকগুলি উৎপাদনে মুনাফার হার অধিক হওয়ায় গড়পড়তা মুনাফার হার খুব বেশী নীচের দিকে নামিতে পারে না। বিদেশে এবং উপনিবেশগুলিতে পুঁজি খাটাইয়া অধিক মুনাফা পাওয়া সম্ভব হয়। উপনিবেশগুলিতে মজুর সস্তা ; সুতরাং সেখানে পুঁজির পরিবর্তমান অংশই অধিক ; মুনাফার হারও বেশী। গড়পড়তা মুনাফার হার এই কারণে অধিক নামিতে পারে না। মুনাফার হার কেন কমে এবং কেনই বা ইহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না তাহার কারণ আমরা নির্ণয় করিলাম। পরিশেষে, একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে শোষণের হার বৃদ্ধি এবং মুনাফার হার হ্রাস এই দুইটি সত্য শ্রমের উৎপাদন শক্তি যে পুঁজিতান্ত্রিক প্রকাশ চায় তাহারই অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ভাবে আমরা অনুমান করি, উৎপাদনশক্তি কমিবার জন্যই বুঝি মুনাফার হার হ্রাস পায়। কিন্তু যথার্থ সত্য ইহার বিপরীত। উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায় বলিয়াই মুনাফার হার হ্রাস হয়।

মুনাফার হার হ্রাস এবং সঞ্চয়ের (accumulation) বৃদ্ধি একই প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। এই দুইটিই উৎপাদনশক্তি যে বৃদ্ধি পাইতেছে

তাহাই সূচিত করে। সঞ্চয় বেশী হইলেই মুনাফার হার আবার কমিবেই, কেননা এই সঞ্চয় খাটাইলেই অধিক পরিবর্তমান পুঁজি এবং ততোধিক অপরিবর্তমান পুঁজি খাটাইতে হইবে। এদিকে আবার মুনাফার হার কমিলে পুঁজির আয়তন বৃদ্ধি এবং ছোট ছোট পুঁজিপতিগণের ধ্বংস দ্বারা পুঁজির কেন্দ্রীভূক্তি (Centralisation) বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রক্রিয়ায় সঞ্চয় বাড়িতেছে সত্য, কিন্তু মুনাফার হার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের হারও (rate of accumulation) কমিতেছে।

এদিকে আবার মোট পুঁজির আয়তনের বৃদ্ধির হার (rate of self expansion of total Capital) অর্থাৎ মুনাফার হার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বহুল-উৎপাদন (over-production), দালাল বৃত্তি (speculation), সঙ্কট, বহুল-পুঁজি (surplus-Capital) এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা (surplus-population) প্রভৃতি সামাজিক ঘটনাগুলি আত্মপ্রকাশ করে।

পুঁজির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব হইতেছে। কারখানায় শ্রমিককে শোষণ করিয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু বাজারে উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয় করিলে তবে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য হাতে পাইবে। উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করা এবং মুদ্রারূপে সেই মূল্য হাতে পাওয়া এক কথা নয়। প্রথমটির সৃষ্টি হয় উৎপাদনের ভিতরে, দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় বাজারে। সমস্ত পণ্য বাজারে বিক্রয় হওয়া চাই, কেননা, এই পণ্যের মোট মূল্যের ভিতরে রহিয়াছে অপরিবর্তমান পুঁজি, পরিবর্তমান পুঁজি এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য। যদি তাহা না হয়, অথবা অংশত হয়, অথবা এমন মূল্যে বিক্রয় হয় যে, উৎপাদনের বাজার-দর উঠে না, তবে শ্রমিককে শোষণ করা সত্ত্বেও এই শোষণ

হইতে মালিক আশানুরূপ লাভ করিতে পারিল না। এমনও হইতে পারে যে, সে কোন উদ্বৃত্ত-মূল্যই পাইল না, অথবা অংশত পাইল। প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের ভিতরে শোষণ করা এবং বাজারে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মুদ্রারূপে পরিবর্তিত করা, দুইটি সম্পূর্ণই দুই জিনিস। যুক্তির দিক হইতে যেমন দুইটি বিভিন্ন, তেমনি সময় এবং দেশ (time and space) দ্বারাও দুইটি বিষয় পৃথকীকৃত। উৎপাদন নির্ভর করে সমাজের উৎপাদনশক্তির উপরে, কিন্তু বাজারে বিক্রয় নির্ভর বিভিন্নরূপ উৎপাদনের আনুপাতিক (Proportional) সম্বন্ধ এবং সমাজের খাদনশক্তির (consuming) উপর। খাদনশক্তি হিসাবে খাদনশক্তির কথা হইতেছে না; যে খাদনশক্তির কথা হইতেছে তাহা সকল সময়ই নির্দেশিত হইবে পরস্পর-বিরোধী বণ্টনাত্মক সম্পর্কগুলি (antagonistic conditions of distribution) দ্বারা। এই খাদনশক্তি একটি সর্বনিম্ন পরিবর্তমান পুঁজিতেই গিয়া সীমাবদ্ধ হয়। শুধু পরিবর্তমান পুঁজিই ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া শ্রমিকের ক্রয়শক্তি হ্রাস করিতেছে তাহাই নয়; পুঁজিপতিরাও অধিক মুনাফা সৃষ্টির জন্য নিজের সম্ভোগের খরচ কমাইয়া মুনাফার বেশী-অংশ পুঁজি হিসাবে খাটাইতে মনোযোগী হইতেছে। এইভাবে খাটানো পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বাড়িতেছে, তেমনি মানুষের ক্রয়শক্তিও সংকীর্ণ হইতেছে। পুঁজিতন্ত্রের এই স্ব-বিরোধী ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছে দুইটি জিনিস; একদিকে পুঁজির বাহুল্য, অন্যদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জনসংখ্যা। এই কারণেই পুঁজিতন্ত্রের বিরোধ আরো তীব্র হইয়া উঠে। শ্রমিককে কম শোষণ করা হইতেছে, তাই মুনাফার হার কমে তাহা নয়; খাটানো পুঁজির আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

সেই অনুপাতে কম শ্রমিককে খাটানো হইতেছে, ইহাই সকল সমস্যার মূল।

পুঁজিতন্ত্রের এই সকল অন্তর্দ্বন্দ সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে সংকটের (crisis) মধ্য দিয়া। পুঁজিতন্ত্রের ধর্মই হইল উৎপাদন-শক্তিগুলিকে (productive forces) চরমভাবে বিকশিত করা। কিন্তু যে সকল উপায়ের মধ্য দিয়া এই বিকাশ সম্ভব হয় তাহার একটি হইল মুনাফার হারের হ্রাস। তাহাকে অতিক্রম করিতে গিয়া পুঁজি নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়। আসল কথা, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার যথার্থ শত্রু পুঁজি স্বয়ং। অধিক হইতে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টিদ্বারা পুঁজি আত্মপ্রসারণ সংঘটিত করিতে গিয়া সৃষ্টি করে ঃ (১) মুনাফার হারের হ্রাস ; (২) পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অত্যধিক সঞ্চয় (accumulation) ; (৩) আপেক্ষিক প্রয়োজনাতিরিক্ত জনসংখ্যা ; (৪) ক্রয়শক্তির হ্রাস।

পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার একমাত্র উদ্দেশ্য পুঁজির আত্মপ্রসারণ ; অর্থাৎ উৎপাদন করা হয় পুঁজিরই জন্য ; উৎপাদনের উদ্দেশ্য কখনো যাহারা উৎপাদন করে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। কিন্তু পুঁজিরই জন্য পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সংঘটিত করিতে গিয়া পুঁজি অধিকাংশ লোককে নিরন্ন, নিঃসহায় না করিয়া পারে না। তখনই উৎপাদন অচল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় পুঁজির প্রসারের পথে অন্তরায়গুলি উৎপাদন-প্রথার সহিত বিরোধিতা শুরু করিয়া দেয়।

পুঁজির প্রাচুর্য এরূপভাবে বাড়িতে থাকে যে একটি সময়ে দেখা যায় এত পুঁজি উৎপাদনে খাটানো আর সম্ভবপর হয় না। এই পুঁজির একাংশ তখন খাটিতে শুরু করে অনুৎপাদনে, যেমন—স্পেকুলেশন, দালালী ইত্যাদিতে। একদিকে যেমন পুঁজির প্রাচুর্যের জন্য

দেখা দিয়াছে বেকার-পুঁজি, তেমনি অপরদিকে দেখা দিয়াছে আপেক্ষিক অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বেকার-শ্রমিক।

এইরূপ অবস্থায় পুঁরাতন পুঁজির একাংশকে অকর্মণ্য না থাকিয়া উপায় নাই। একই অকর্মণ্য পুঁজির পরিমাণ যে কি হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে প্রতিযোগিতামূলক সংঘর্ষ। যতক্ষণ শিল্পব্যবসায়-জগতে সুসময়, পুঁজিতন্ত্র ততক্ষণ পুঁজিপতিগণের ভিতরে সৌভ্রাত্র্য স্থাপন করাইয়া রাখে। সকলই তখন গড়পড়তা মুনাফার হার লইয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু যখনই আর মুনাফার উপরে ভাগ বসানোর কথা থাকে না, সকলকেই লোকসান দিতে হয়, প্রত্যেকেই চেষ্টা করে তাহার লোকসানের পরিমাণ কমাইয়া অন্যের উপর চাপাইতে। যেমনই হউক শ্রেণী হিসাবে পুঁজিপতিরা লোকসান না দিয়া পারে না। তখনকার প্রতিযোগিতা সুসময়ের সৌভ্রাত্র্য ভাঙ্গিয়া দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু হিসাবে দাঁড় করায়। এই প্রতিযোগিতায় দেখা যায় এক অংশ পুঁজি হয়ত বা নিষ্ফলাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অপর এক অংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই যে পুঁজির ধ্বংস হইল, উহার কারণ পুঁজির অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বাহুল্য। কিন্তু এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, এই বাহুল্য পুঁজি হিসাবেই বাহুল্য; অন্য রকম সমাজ-ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতির বাহুল্য মোটেই বাহুল্য নয়। তাহা হইলে দেখা গেল, উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন-দ্রব্যের সংখ্যা বাড়িয়াছে, বাজারের পরিসর বাড়িয়াছে; পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, মুনাফার হার কমিয়াছে, আর প্রয়োজনাতিরিক্ত জন-সংখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

পুঁজির সঞ্চয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট মুনাফার হারের হ্রাস হইতেই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। কেহ যেন মনে না করেন যে মুনাফার হার হ্রাস হয় প্রতিযোগিতার জন্য। সমগ্র পুঁজির বেলায় অথবা কোন

কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই বলা যাইতে পারে যে মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ায় যে ক্ষতি হইল তাহার পূরণ হয় ক্রমবর্ধমান মুনাফার পরিমাণ দ্বারা। কিন্তু অত্যধিক পুঁজির সৃষ্টির জন্য নূতন নূতন পুঁজি যে সকল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিল, তাহাদের বেলায় এই মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষতিপূরণ করার কথা উঠে না। তাহারা শুরু করে গোড়া হইতে; পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির অপেক্ষা এই সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অপেক্ষাকৃত বেশী নিয়োগ হইবে, সুতরাং মুনাফার হার এই সকল প্রতিষ্ঠানে হইবে অধিক। ঠিক এই কারণেই কিছু কালের জন্য মজুরের চাহিদাও বাড়িবে বেশী; কিন্তু মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মুনাফার হারও আবার কমিবে।

সুতরাং দেখা গেল যে পুঁজিতন্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষের অভাব মিটানোর জন্য উৎপাদন নয়; ইহার উদ্দেশ্যে মুনাফা-সৃষ্টি। বর্তমান উৎপাদন-প্রথায় দ্রব্যোৎপাদন যথেষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু মানুষের সকলরকমের অভাব মিটানোর পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। কখনো ইহা সত্য নয় যে এতবেশী যন্ত্রপাতির উৎপাদন হইয়াছে যে সমাজে উৎপাদনের উপযোগী যে নরনারী রহিয়াছে, তাহাদের কাজ দিয়া শেষ করা হইয়াছে।

আসল কথা, কয়েক বৎসর পর পর দেখা যায় যে এত বেশী উৎপাদনের যন্ত্র এবং ব্যবহারযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে যে একটি বিশেষ হারের মুনাফা রক্ষা করিতে হইলে ইহাদের দ্বারা লাভজনকভাবে শোষণকার্য করা চলে না, পুঁজিতন্ত্রের বিশেষ প্রকারের বণ্টন-বিধিকে রক্ষা করিয়া পুঁজির শোষণকার্যকে সকলসময়ের জন্য অব্যাহত রাখা চলে না।

কখনো ইহা সত্য নয় যে ধনোৎপাদন অত্যধিক হইয়াছে; তবে কখনো কখনো পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনোৎপাদন

হইয়া পড়ে। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার অন্তরায় নিম্নোক্ত দুইটি সত্যের ভিতরে ফুটিয়া উঠে ঃ

১। শ্রমের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ মুনাফার হারের হ্রাসের ভিতরে এমন একটি সূত্র (law) সৃষ্টি করে যে একটি বিশেষ সময়ে এই বিশিষ্ট উৎপাদন-প্রথার সহিত ইহা শত্রুতার সম্বন্ধেই দাঁড়ায়। এই বিরোধিতায় উৎপাদন-প্রথার পরাজয় অনিবার্য ; এই পরাজয়ের প্রকাশ হয় সংকটের মধ্য দিয়া।

২। উৎপাদনের প্রসারণ অথবা সংকোচন নির্ভর করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, অথবা মোট পুঁজির সহিত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতের উপরে। এই অনুপাতেই পুঁজিপতির ভাষায় মুনাফার হার। সমাজের অন্তর্গত মানুষগুলির চাহিদার দিকে লক্ষ্য করিয়া পুঁজিতন্ত্রের উৎপাদন-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তাই পুঁজিতন্ত্র অগ্রসর হইতে হইতে এমন সকল অন্তরায়ের সম্মুখে দাঁড়ায় যে তাহার গতি স্তব্ধ না হইয়া পারে না।

শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করাই পুঁজির ঐতিহাসিক কার্য এবং দায়িত্ব। ঠিক এই পথেই পুঁজিতন্ত্র অজানিত (unconscious) একটি উচ্চতর উৎপাদন-প্রথার বনিয়াদ সৃষ্টি করে। পুঁজির যুগ একটি সীমাবদ্ধ সামাজিক ঘটনা ; সুতরাং উৎপাদন-প্রথার উন্নয়নের পক্ষে পুঁজি-যুগের বিশিষ্ট অন্তরায়গুলি বিলীন না হইয়াই পারিবে না।

কারখানাওয়ালা মালিক তাহার কারখানায় ত্রিশহাজার গজ কাপড় উৎপন্ন হওয়া মাত্র ৩০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এ মার্চেণ্টের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া দিল। এই টাকা হাতে পাইয়া সে কাপড় পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইল। মালিক এই মার্চেণ্টকে নিকটে পায় বলিয়া তাহার উৎপাদনের কার্য সে অব্যাহতভাবে পরিচালনা করিতে সমর্থ হয়। মালিকের দিক

হইতে দেখিতে গেলে, তাহার পণ্যকে সে মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে পরিয়াছে। অবশ্য কাপড় এখনও তাহার প্রকৃত গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারে নাই। উৎপাদনের জন্যই হউক, আর ভোগের জন্যই হউক, এখনও কাপড় মার্চেন্টের হাত ছাড়াইয়া এমন লোকের নিকট পৌঁছায় নাই যেখানে ইহা ব্যবহার-মূল্য (use-value) রূপে কাজে আসিবে। যে কাপড় মালিকের হাতে ছিল তাহাই এখন মার্চেন্টের হাতে রহিল ; মার্চেন্টের অভাবে মালিককে যে কাজ করিতে হইত মার্চেন্টই এখন তাহা করিবে। মালিকের কাজ সংক্ষিপ্ত হইয়া গেল, কেননা মার্চেন্ট তাহার কাজের ভার লইয়াছে।

মার্চেন্ট মধ্যস্থর কাজ করে মাত্র ; পণ্যোৎপাদন তাহার কার্য নয়। জিনিস কিনিয়া জিনিস বিক্রয় করাই তাহার ব্যবসায়, কিন্তু কিনিতে গেলেই তাহার হাতে মুদ্রা থাকিতে হইবে। মুদ্রারূপ পুঁজির (money capital) মালিক তাহাকে হইতে হইবে। সুতরাং সমাজের সমগ্র পুঁজির একাংশ বাজারে অর্থাৎ সঞ্চারণের (circulation) কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। এই পুঁজিকেই বলা হয় ব্যবসায়ী-পুঁজি (merchant capital)। উৎপাদনে যে পুঁজি খাটে তাহা হইতে এই পুঁজি ভিন্ন। বাজারে এই পুঁজি আছে বলিয়াই মালিককে তাহার কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যাদি লইয়া বিক্রয়ের জন্য অনির্দিষ্টকাল বাজারে বসিয়া থাকিতে হয় না।

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিতরে কোন মূল্য এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয় না। এখানে শুধু পণ্য এবং মুদ্রার হস্তান্তরই হইয়া থাকে। বিক্রয় দ্বারা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য হাতে পাওয়া যায় তাহার কারণ এই নয় যে নূতন কোনও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হইয়াছে ; উৎপাদিত পণ্যের ভিতরে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য নিহিত রহিয়াছে তাহাই মাত্র মুদ্রার রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। ব্যবসায়ী-পুঁজি উদ্বৃত্ত-

মূল্য উৎপাদন করে না ; উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মাত্র মুদ্রায় রূপান্তরিত করে। সমাজের মোট পুঁজির বিভাগের জন্য উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনের কার্য শীঘ্র শীঘ্র সম্ভব হয়। অথচ কারখানায় যে পুঁজি খাটে তাহার তুলনায় ব্যবসায়িক পুঁজির পরিমাণ খুব কম চলে।

দ্রব্যের পুনরুৎপাদনের জন্য উৎপাদনের স্তরের মতন সঞ্চারণের স্তর একইভাবে প্রয়োজনীয়। সুতরাং কারখানা-পুঁজি হইতে স্বতন্ত্রভাবে যে পুঁজি খাটে তাহার জন্যও একটি গড়পড়তার মুনাফার হার চাই। ব্যবসায়িক পুঁজিতে মুনাফার হার অধিক হইলে কারখানা পুঁজির একাংশ সে দিকে আকৃষ্ট হইবে ; আবার ব্যবসায়িক পুঁজির মুনাফার হার কম হইলে ইহার একাংশ কারখানা-পুঁজির দিকে আকৃষ্ট হইবে। ব্যবসায়িক পুঁজি নিজে যখন কোন উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে না ; তখন কারখানা-পুঁজি যে মুনাফা সৃষ্টি করে তাহারই একাংশ এই পুঁজির মুনাফা হইবে। এখন কথা উঠিবে, ব্যবসায়িক পুঁজি সমগ্র মুনাফার তাহার আপন অংশ কিভাবে আত্মসাৎ করিবে।

ধরা যাউক, একবৎসরে মোট কারখানা-পুঁজি দেওয়া হইয়াছে ৭২০c+১৮০v=৯০০ ; শোষণের হার ১০০%। যে দ্রব্য তৈয়ারী হইল তাহার মোট মূল্য ১০৮০ ; সমগ্র দ্রব্যের মোট মূল্য এবং উৎপাদনের বাজার-দর যে একই, পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি। সমাজে সমগ্র পুঁজির মুনাফার হার একই ক্ষেত্রে ২০%। আমাদের পূর্বের হিসাব অনুযায়ী গড়পড়তা মুনাফার হার দেখা গেল শতকরা কুড়ি। কিন্তু এই ৯০০ ছাড়াও আরো ১০০ ব্যবসায়িক পুঁজি হিসাবে খাটে ; সুতরাং মোট পুঁজির পরিমাণ ৯০০+১০০=১০০০। ব্যবসায়িক পুঁজি এই মোট পুঁজির দশমাংশ। এই ক্ষেত্রে উভয় পুঁজির গড়পড়তা মুনাফা হইবে ১৮%। কারখানার মালিকেরা মার্চেণ্টদের নিকট

উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবে $৭২০c+১৮০v+১৬২s=১,০৬২$। মার্চেণ্ট আবার বাজারে পুরা মূল্যে অর্থাৎ $৭২০c+১৮০v+১৮০s=১০৮০$-এ বিক্রয় করিবে। মার্চেণ্টের পুঁজি গড়পড়তা মুনাফার হার ঠিক করিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাথমিক সঞ্চয়

পুঁজিতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত মুদ্রার কাজ ছিল, বাজারে দ্রব্য-ক্রয়। কিন্তু যখন হইতে মুদ্রা দ্বারা একটি বিশেষ প্রকারের পণ্য ক্রয় হইতে লাগিল, তখন হইতেই শুরু হইয়াছে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা। এই বিশেষ প্রকারের পণ্যটি অপর আর কিছুই নয়,—শ্রমিকের শ্রম-শক্তি। তখন হইতেই মুদ্রা পরিবর্তিত হইল পুঁজিতে। পুঁজির একমাত্র ধর্ম তাহার আপন প্রসার এবং মুনাফা সৃষ্টি। এইরূপ উৎপাদন-প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে কতকগুলি লোকের হাতে মুদ্রার সঞ্চয় হইয়াছিল; ইহাকে বলা হয় ব্যবসায়িক পুঁজি। কেননা ব্যবসায় হইতেই তাহা আহৃত। এই সঞ্চয়কে মার্কস আখ্যা দিয়াছেন প্রাথমিক সঞ্চয় (Primitive Accumulation).

বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া আদম যে পাপ করিয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ভব হইয়াছে মানুষের দুর্গতি। তখন হইতেই মানুষকে জীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা। কিন্তু 'বুর্জোয়া-ইকনমি' আমাদের শিক্ষা দিয়াছে যে, সকল

মানুষকেই গ্রাসাচ্ছদনের জন্য মেহনত করিতে হয় না। অধিকাংশ লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উৎপাদন করিবে; কতিপয় মুষ্টিমেয় লোক তাহার ফলভোগ করিবে। 'বুর্জোয়া-ইকনমি' নীতি শিক্ষা দিতেও ছাড়ে নাই। প্রথম হইতেই যাহারা অমিতব্যয়ী, সঞ্চয় করিতে পারে নাই—দুঃখ তাহাদেরই। সৎভাবে যাহারা জীবন-যাপন করিতে পারিয়াছে, তাহারাই মাত্র এখনও পর্যন্ত বিনা-মেহনতেই জীবিকা অর্জন করিতে পারিতেছে। কিন্তু যথার্থ ইতিহাস কি ইহাই? ইতিহাস বলিবে—এইরূপ অধিকার-বৈষম্যের কারণ যুদ্ধ, হত্যা, দস্যুতা,—এক-কথায় সকলরকমের জুলুম এবং জবরদস্তি। প্রাথমিক-সঞ্চয় সম্ভব হইয়াছিল এগুলিরই সহায়তায়।

মুদ্রা, পণ্য, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি পুঁজিতন্ত্রের পূর্বেও ছিল; কিন্তু তখন ইহারা পুঁজি ছিল না। পুঁজিতে ইহাদের রূপান্তর, অমনি-অমনিই সম্ভব হয় নাই। পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল কথাই হইল—এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা চাই যেন বহুলোক যন্ত্রপাতির অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়; তবেই ইহারা নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণাদির সাহায্যে আপন শ্রম-শক্তিকে বাস্তব আকার দিবার সুযোগ পাইবে না। একবার পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হইলে মানুষ ও তাহার যন্ত্রপাতির বিচ্ছেদ পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষণই করে না, বিচ্ছেদকে বাড়াইয়া তোলাই হইয়া উঠে ইহার ধর্ম। অধিক হইতে অধিকতর লোককে তাহাদের যন্ত্রপাতির অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া শ্রমিক-জীবন যাপন করিতে বাধ্য করাই তখন পুঁজির প্রধান কাজ হইয়া উঠে। উৎপাদনকারীকে তাহার যন্ত্রপাতি হইতে বিচ্যুত করাই হইয়া দাঁড়ায় তথা-কথিত প্রাথমিক সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক কার্য।

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক কাঠামো ফিউদ্ ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূদ

হইয়াছে। ফিউদ্-ব্যবস্থার ভিতরেই পুঁজিতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল; প্রথমটির বিনষ্টি হইতেই পরেরটির জন্ম হইয়াছে।

উৎপাদনকারী ফিউদ্-যুগের বন্ধনদশা হইতে বিমুক্ত হইয়াই প্রকাশ্য বাজারে তাহার শ্রম-শক্তি বিক্রয় করার অধিকার অর্জন করে। বুর্জোয়া এতটুকুই বুঝিতে পারে যে উৎপাদনকারীকে মজুরে পরিবর্তিত করিতে হইলে পূর্বেকার গিল্ড প্রভৃতি উৎপাদন-প্রথার বিলোপ আবশ্যক। কিন্তু সে স্বীকার করিতে রাজী নয় অথবা দেখিয়াও দেখিতে চায় না যে উৎপাদনকারীকে মজুরে পরিবর্তিত করার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদনের উপকরণের অধিকার তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছে। ফিউদ্-তন্ত্র হইতে উৎপাদনকারী মুক্তিলাভ করিল বটে; কিন্তু ফিউদ্-তন্ত্র তাহাকে যেমন জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে পারিত, পুঁজিতন্ত্র তাহা দিতে পারিল না। পুঁজিপতি কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি আপন অধিকারে আনার কাহিনী মনুষ্যজাতির ইতিহাসে রক্তের ও আগুনের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে।

গিল্ডের উচ্ছেদই শুধু নয়, অভিজাতবর্গের বিনাশও পুঁজিপতি মালিকের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। কেননা, এই শ্রেণীর হাতেই তখনো সকল বিত্তের অধিকার। মালিক সমাজের অধিকাংশ লোককে স্বাধীনভাবে যদৃচ্ছ শোষণ করিবে,—অভিজাতবর্গ ছিল পুঁজিপতির এইরূপ লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠ অন্তরায়। যেমনই হউক, মজুরের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রকমের দাসত্বও তাহার বাড়িয়া গেল। এই দাসত্ব ফিউদ্-তন্ত্রী-দাসত্ব হইতে পুঁজিতন্ত্রী দাসত্বে রূপ-পরিবর্তন মাত্র। এই ব্যাপারটির মূল সত্য হইল পুঁজিতন্ত্র কর্তৃক কৃষককে জমি হইতে ছিনাইয়া লইতে পারার সাফল্য।

চৌদ্দ-শতকের শেষাংশে ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথা প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। তখন জন-সংখ্যার অধিকসংখ্যকই ছিল কৃষক। তাহারা জমিদারবর্গের

অধীনে আপন আপন জমি চাষ করিত। কৃষি-মজুরের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। অনেক সময় অনেক কৃষকই অবশ্য কৃষি-মজুরের কাজ করিত। কৃষি-মজুরও কখনো সম্পূর্ণভাবে জমিচ্যুত হয় নাই; তাহাদের বাসগৃহের সঙ্গে অন্তত চার-পাঁচ একর জমি সংযুক্ত থাকিতই। তাহা ছাড়া, অন্যান্য কৃষকের মতনই গোচরণ-ভূমি এবং গ্রাম-স্থলীর অধিকারও তাহারা ভোগ করিত।

মধ্যযুগে উৎপাদন-প্রথা ইউরোপের সকল দেশেই প্রায় একই প্রকার ছিল। রাজার নীচে ছিল কতিপয় অভিজাত। সর্বনিম্নে ছিল কৃষক। জমির বিভাগও করা হইত উপরোক্ত স্তর অনুসারে। কৃষকগণের ভিতরে জমি ভাগ করিয়া দেওয়া হইত বটে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডগুলির ভিতরে মাঝে মাঝে দেখা যাইত বৃহদায়তন ভূমিখণ্ড। এই-গুলি জমিদারেরা নিজেদের অধিকারেই রাখিত। কৃষকেরা সপ্তাহে কয়েকটা দিন জমিদারের জমিতে বেগার দিত।

পনর-শতকের শেষার্ধে উৎপাদন-প্রথায় পুঁজিতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রথম সূচনা দেখা দিল। রাজা এবং ফিউদ্-অভিজাতবর্গের পরস্পর যুদ্ধের ফলে নূতন এক শ্রেণীর অভিজাতের জন্ম লইল। এই নূতন অভিজাতবর্গের ধারণা হইল, অর্থই একমাত্র শ্রেষ্ঠ শক্তি; যে কোন উপায়েই হউক অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় চাই-ই। চাষের জমিকে মেষ-চারণের ভূমিতে পরিবর্তিত করাই হইয়া দাঁড়াইল তাহাদের একমাত্র চেষ্টা। পশমের তখন খুব চাহিদা। এই নূতন অভিজাতবর্গ তাই বে-আইনী উপায়ে এবং জবরদস্তি করিয়া এজমালী জমি এবং ব্যক্তিগত ভূমি দখল করিতে শুরু করিয়া দিল এবং তাহা ঘেরিয়া ফেলিতে লাগিল।

এই সময়ে আরো একটি ঘটনা আত্মপ্রকাশ করিল। 'রিফর্মেশনের' সময়ে কেথলিক চার্চ ছিল ইংলণ্ডের বহু জমির জমিদার।

ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া জমি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযাজকসম্প্রদায় নিঃস্বত্ব হইয়া পড়ে। জমিগুলি অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইল রাজার অনুগৃহীত লোকদের নিকট। ইহারা কৃষকগণের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া তাহাদের জমি হইতে উৎখাত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না। এইরূপে বহুলোক জমিচ্যুত হইলে রাণী এলিজাবেথের সময়ে 'Poor Rate' আইন করিয়া ইহাদের 'Pauper' বলিয়া ঘোষণা করা হইল। উইলিয়ম কবেট তাহার ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন—সকল আইনের গোড়াতেই একটি করিয়া ভূমিকা (Preamble) সন্নিবিষ্ট করা হয়; কিন্তু 'Poor Rate' আইনে কোন ভূমিকা নাই। বিষয়টি এতই লজ্জাকর এবং বর্বরোচিত ছিল যে ব্যবস্থাপকেরা তাহা বাদই রাখিয়া গিয়াছেন।

কৃষকগণের অপেক্ষা একটু উচ্চস্তরে ছিল ফার্মার সম্প্রদায়; সতর শতকের শেষ-দশকেও দেখা গিয়াছে, কৃষকের সংখ্যা ছিল ফার্মারের সংখ্যা হইতে অধিক। কৃষকগণের নাম ছিল 'ইয়ম্যান'। তাহারা নিজেদের জমিতে নিজেরা খাটিত, ফার্মারেরা জমিদারদের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া কৃষি-মজুর সহযোগে ফসল উৎপাদন করিত। ইহাদের আমরা বলিব পুঁজিপতি। ১৭৫০-এর ভিতরে স্বাধীন উৎপাদনকারী কৃষকশ্রেণী একেবারেই নির্মূল হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইল সর্বসাধারণের অধিকার ভুক্ত-ভূমি।

ষ্টুয়ার্টদের সিংহাসনে পুনঃ-অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতে আইনের সাহায্যেই এই জমি আত্মসাৎ শুরু হইল। ১৬৮৮-র বিপ্লব শুধু 'উইলিয়ম্ অফ্ অরেঞ্জকেই' বিদেশ হইতে আমদানী করে নাই; সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতির দলকেও সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্রের অধীনে যে-সকল জমি ছিল সেগুলি একপ্রকার বিনামূল্যেই বিক্রয় হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া অনেক ভূস্বামী রাষ্ট্রের কোন প্রকার অনুমতির অপেক্ষা

না রাখিয়াই নিজেদের জমির সঙ্গে রাষ্ট্রের জমি জুড়িয়া দিল। এইভাবে রাষ্ট্রের এবং চার্চে-র জমিগুলি অধিকার করিয়া নূতন ভূ-স্বামীরা আপন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল। বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা এই ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া পারে না; কেননা, ইহা হইতে মজুরের সংখ্যাও বাড়িবে; আবার পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে চাষ করাইয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য উপার্জনও সম্ভব হইবে।

পনর ও ষোল শতকে কি করিয়া সম্পূর্ণ জুলুমের সাহায্যে জমি কৃষকের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। আঠার শতকে কিন্তু পূর্বেকার মত জমি আত্মসাৎ করিয়া লওয়া বে-আইনী রহিল না। পার্লামেণ্ট আইন করিয়া এই ব্যাপারটিকে সমর্থন করিতে লাগিল। 'জমি ঘেরাও করিয়া লওয়া'-মূলক (enclosure) পার্লামেণ্টের আইনগুলির প্রতি দৃক্‌পাত করিলেই তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। এই আইনগুলির বলেই ভূস্বামীরা সাধারণ-সম্পত্তিগুলি নিজেদের ভিতরে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতে পারিয়াছে।

আঠার শতকে তেমন বুঝিতে পারা যায় নাই; উনিশ শতকেই ভাল করিয়া বুঝা গিয়াছে—সামাজিক বৃত্তের বৃদ্ধি দারিদ্রেরই নামান্তর। এই সময়ে সমাজের সর্বনিম্নতম লোকেরা ক্রমেই দরিদ্র হইতে লাগিল; জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনিব হইতে তাহারা দিন-মজুরে পরিণত হইতে লাগিল। জীবন-যাত্রার জন্য যাহা সর্বনিম্ন-পরিমাণ মজুরী তাহারও নীচে আসিয়া যখন নামিল, তখনই মজুরীর পরিপূরক হইয়া আসিল 'পুওর রেট' (Poor rate)

চার্চ ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি আত্মসাৎ, সাধারণ সম্পত্তির উপর জোর করিয়া অধিকার বিস্তার, ফিউদ্-যুগের কৃষকগণকে সম্পত্তি হইতে অপসারণ—এগুলিই হইল প্রাথমিক-সঞ্চয়ের নৃশংস কাহিনী। এ সকল কারণে পুঁজিতান্ত্রিক প্রথায় জমি চাষের যেমন একদিকে সুবিধা হইয়া

গেল, তেমনি কৃষককে মজুরে পরিণত করিয়া শহরে কারখানায় খাটাইবারও সুযোগ দেখা দিল।

ধীরে ধীরে মজুরের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইল যে উৎপাদন কখনো তাহাদের সকলকে কাজ জোগাইতে পারিল না। ইহা ছাড়া, এই দুর্ভাগা মানুষগুলি সহসা তাহাদের গতানুগতিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় নূতন অবস্থার সঙ্গে একদিনেই খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিল না। কাজে কাজেই, ইহাদের অনেককেই হইতে হইল ভিক্ষুক, চোর, দস্যু। এই বৃত্তিগুলি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের শাস্তি দিবারও ব্যবস্থা করা হইল। একমাত্র বৃদ্ধ ও বয়স্ক ভিক্ষুকদের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা হইল; প্রাপ্তবয়স্ক কাহাকেও ভিক্ষা করিতে দেখিলে শাস্তিস্বরূপ তাহাদের মিলিত কয়েদ ও বেত্রদণ্ড। কোনও ভিক্ষুককে কাজ করিতে বলিলে সে যদি অস্বীকৃত হয় তবে তাহাকে দাসরূপে গণ্য করা হইত। তাহার গালে অথবা পৃষ্ঠদেশে লিখিয়া দেওয়া হইত 'S' (Slave)।

এইরূপে, একদিকে কৃষিজীবী লোকগুলিকে জমির অধিকার ও চাষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ভিক্ষুক, চোর এবং দস্যুতে পরিণত করা হইল; অপরদিকে তাহাদের শায়েস্তা করার জন্য নানাবিধ নিগ্রহকারী আইনেরও ব্যবস্থা করা হইল।

আমরা জানি, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন যত বেশী অগ্রসর হয়, ততই উত্তরোত্তর অধিক লোক জমিচ্যুত হইয়া শ্রমিক-জীবন গ্রহণ করিতে এবং বেকার হইতে বাধ্য হয়। মোট জন-সংখ্যার একটি অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সংখ্যা সকল-সময়ই কর্মহীন অবস্থায় থাকে। শ্রমিকের জন্য বাজারে যে চাহিদা তাহা অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অধিক; ফলে, তাহার পক্ষে মজুরী যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়ার সুযোগ ঘটে। পুঁজিতন্ত্রের প্রথমযুগেই এই সুবিধা পুজিপতি গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাই শ্রমিক যাহাতে অধিক মজুরী দাবী করিতে না পারে, এইরূপ ব্যবস্থার জন্য মালিকেরা রাষ্ট্রকে দিয়া আইন করাইয়া লয়। নিদর্শন স্বরূপ, এলিজাবেথের সময়ের একটি আইনের কথা উল্লেখ করিলেই চলিবে। যদি কোনও মালিক বেশী মজুরী দেয় তবে তাহার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হইল দশদিনের কয়েদ; আর যদি কেহ অধিক মজুরী গ্রহণ করে তবে তাহার জন্য বিধান হইল একুশদিনের কয়েদ; আরও কতকগুলি আইন হইল যাহার জোরে পুঁজিপতি শ্রমিককে নির্দিষ্ট মজুরীতে অধিক সময় খাটাইতে গিয়া প্রয়োজনমত কায়িক শাস্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে। চৌদ্দ শতক হইতে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকগণের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া বে-আইনী ও নিষিদ্ধ ছিল।

ইংলণ্ডের কথা ছাড়িয়া ফরাসীর কথাই ধরা যাউক। ফরাসী-বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সবে-ক্ষমতাপ্রাপ্ত বুর্জোয়াগণ ১৭৯১ সনের ১৪ই জুন একটি আইন প্রণয়ণ করিয়া ঘোষণা করিল, শ্রমিক-সংঘ ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী। সুতরাং যে-কেহ সংঘ করিবে অথবা সংঘে যোগদান করিবে তাহার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হইল পাঁচশত লিভার জরিমানা। শুধু তাহাই নয়, এক বৎসর তাহার কোন নাগরিক অধিকারই থাকিবে না।

কৃষি-মজুরের উদ্ভব কি ভাবে হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। 'ফার্মার-শ্রেণী' কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই এখন বিবেচ্য। ইংলণ্ডে 'বেইলিফ' নামে একটি সম্প্রদায় ছিল—ইহারা 'সার্ফ' অথবা আধা-দাস। চৌদ্দ-শতকের মাঝামাঝি ইহাদের জায়গায় দেখা দিল 'ফার্মার'। ভূস্বামীরা ইহাদের বীজ, যন্ত্রপাতি ও পশু প্রভৃতি সরবরাহ করে। কৃষক হইতে তাহাদের খুব বেশী প্রভেদ নাই; এইটুকু পার্থক্য যে 'ফার্মার' জমিতে মজুর নিয়োগ করিয়া থাকে। তারপর সে হইয়া

দাঁড়ায় 'মেটায়ার'—আধা-আধি ফার্মার। কৃষির জন্য যে-সকল উপকরণ প্রয়োজন তাহার একাংশ এখন হইতে সে নিজেই দেয়, অপর অংশ ভূম্যধিকারী জমিদারের। ধীরে ধীরে উৎপাদনের জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন তাহার সবটুকু অংশই সে নিজেই দিতে আরম্ভ করে। মজুর নিয়োগ করিয়া যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সে সৃষ্টি করায়, উহারই একটি অংশ হয় তাহার মুনাফা, অপর অংশটি ভূম্যধিকারীর 'রেণ্ট' অথবা খাজনা। এইভাবে প্রকৃত পুঁজিবাদী 'ফার্মারের' উদ্ভব হইল।

কৃষকশ্রেণীর উচ্ছেদ হইতে যেমন 'ফার্মারের' সৃষ্টি হইল, তেমনি পুঁজিপতির পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্য একটি স্ব-দেশীয় বাজার দেখা দিল। পূর্বে কৃষক ও তাহার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত লোকেরা নিজেদের জমিতে ফসল উৎপাদন করিত; অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও আপন পরিবারের গণ্ডীর ভিতরেই তৈয়ারী হইত। পুঁজিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে এই ঐক্যটি একেবারেই ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার আবির্ভাবে কৃষকের আত্মনির্ভর-জীবনের আর কোনরূপ চিহ্ন রহিল না। খাদ্যাদি এখন আর কৃষক স্বয়ং উৎপাদন করে না। এখন হইতে পুঁজিপতির হাতে যে পুঁজি রহিয়াছে, কৃষকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া গেল, অর্থাৎ তাহাকে এখন মজুরী অর্জন করিয়া পুঁজিপতির কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি খরিদ করিতে হইবে। এইভাবে একটা খরিদ্দারশ্রেণী সৃষ্টি হইয়া স্বদেশেই পুঁজিপতির পণ্যাদির বাজার দেখা দিল।

বর্তমান যুগ মধ্যযুগ হইতে দুই রকমের পুঁজির উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে। একটি কুশীদজাত পুঁজি, অপরটি ব্যবসায়িক পুঁজি; সুদ খাইয়া যে পুঁজি জমানো হইয়াছে তাহাই প্রথম পুঁজি; ব্যবসায় হইতে যে পুঁজি জন্মিয়াছে তাহা ব্যবসায়িক পুঁজি। একজন বিখ্যাত

গ্রন্থকার আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, কুশীদের বিরুদ্ধে এত প্রকার আইন করা হইল, তবুও পুঁজি এত জঁাকিয়া বসিল কি করিয়া? কোন্ আইনের বলে পুঁজি এখনকার এই বিত্তের অধিকারে এত পরিবর্তন ঘটাইতে পারিল? প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন কখনো আইনের বলে সম্ভব হয় না।

একটা সময়ে দেখা গেল, কুশীদ ও ব্যবসায় হইতে যে সঞ্চয় হইয়াছে কারখানা-পুঁজিতে উহার পরিবর্তিত হওয়ার পথে সাক্ষাৎ সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামন্ত-তন্ত্রের অপসারণ হইলে তবে এই শৃঙ্খল দূর হইল।

আমেরিকার সোণা ও রূপা আবিষ্কার, আদিম-অধিবাসীদের উপর সকল প্রকারের পীড়ন, ইষ্ট-ইণ্ডিজ জয় ও লুঠ, আফ্রিকার কাল-আদমি শিকার ও সংগ্রহ,—এইগুলিই হইল পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের গোড়ার দিককার ইতিহাস। প্রাথমিক-সঞ্চয়ের এগুলিই মূল। এগুলিরই পশ্চাতে আসিয়াছে ইউরোপীয় জাতিগুলির সারা-পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য-যুদ্ধ।

সতর-শতকে ইংলণ্ডে প্রাথমিক-সঞ্চয়ের যতগুলি উপায় আছে তাহার সবগুলিই একসঙ্গে দেখা দেয়। উপনিবেশ-অধিকার, জাতীয়-ঋণ সংগ্রহ, নবোদ্ভাসিত টেক্স-পদ্ধতি, শুল্কনীতিতে সংরক্ষণপন্থা ইহাদের কোনটিই বাদ পড়িল না। এগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে পশুবল অথবা রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ। ইহাদের সহযোগে সামন্ত-তন্ত্র হইতে পুঁজিবাদে পরিবর্তন সুসাধ্য হইয়াছে। পুরাতন সমাজের গর্ভ হইতে সদ্য-অঙ্কুরিত নূতন সমাজকে টানিয়া বাহির করিতে হইলে বল-প্রয়োগই (force) করিবে ধাত্রীর কাজ।

খৃষ্টধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হাউয়িট একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি করিয়াছেন ঃ জগতের সর্বত্র এবং সকল জাতির উপর খৃষ্টধর্মীয় জাতিগুলি যে পরিমাণ নৃশংস ও বর্বরোচিত আচরণ করিয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সতর শতকে হল্যাণ্ড ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির শীর্ষস্থানীয়। সে যুগে ওলন্দাজদের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, নীচতা ও বর্বরতার ইতিহাস ছাড়া অপর আর কিছু নয়। জাভার ওলন্দাজ পুঁজিপতিদের অধীনে দাস জীবন যাপন করিবার জন্য ছেলে-চুরি হইয়া দাঁড়াইল ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মস্ত অঙ্গ এবং বিশেষত্ব; একটি সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, এক মেকেসার শহরেই এই চুরি-করা ছেলেগুলিকে হস্ত-পদ-শৃঙ্খলিত অবস্থায় বন্দী ও লুক্কায়িত রাখিবার জন্য যে কত সহস্র কয়েদখানা রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইংলণ্ডের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে একদিকে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে, অপরদিকে প্রাচ্যের বহুস্থানে, বিশেষত, চীনে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকার অর্জন করে। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য এবং উপকূল-বাণিজ্য হইয়া দাঁড়াইল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ চাকুরেদের একচেটিয়া। লবণ, পান, আফিং প্রভৃতির একচেটিয়া স্বত্ব অর্থাগমের একটি অফুরন্ত উৎস। এই চাকুরে-ব্যবসায়ীরা নিজেরাই জিনিসের দর নির্দিষ্ট করিয়া দিত। স্বয়ং বড়লাটদের পর্যন্ত এইরূপ কার্যে হাত থাকিত। এক শিলিংও খাটাইবার প্রয়োজন হয় নাই, অথচ পুঁজির সঞ্চয় শুধু বাড়িয়াই চলিয়াছে। পার্লামেণ্টে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার হইতে অনেক-কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হেষ্টিং সালিভ্যান নামে একজন ইংরাজ কর্মচারীকে আফিমের চুক্তি দেয়; সালিভ্যান বিন্ নামে অপর একজনার নিকট এই চুক্তি বিক্রয় করে; সে আবার

ষাট হাজার পাউণ্ডে ইহা অপরকে দিল ; এইভাবে একজন অপরজনকে চুক্তিটা ছাড়িয়া দিয়া মুনাফা রাখিত। পার্লামেন্টে একটি তালিকা পেশ করা হইয়াছিল, তাহা হইতে দেখা যায়, ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৬-র ভিতরে কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা ভারতীয়দের ভিতর হইতে একমাত্র বখ্‌শীষ্‌ হিসাবেই পাইয়াছে ষাট লক্ষ পাউণ্ড। ১৭৬৯-৭০-এ ইংরাজ বণিকেরা সমস্ত উৎপাদিত ধান ক্রয় করিয়া এবং আটকাইয়া রাখিয়া ভারতবর্ষে ভীষণ একটি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। অত্যধিক দাম না লইয়া ধান ছাড়িতে তাহারা রাজী হইত না।

ঔপনিবেশিক লুঠ-তরাজ ছাড়াও প্রাথমিক সঞ্চয়ের আরো একটি চমৎকার উপায় আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয়-ঋণ অথবা গভর্ণমেন্টকে ঋণ দানের ব্যবস্থাদ্বারা পুঁজিপতির হাতে মোটা রকমের সুদ জমিতে শুরু করিল। জাতীয় ঋণ হইতেই উদ্ভব হইল ব্যাঙ্কের। যাহারা সরকারকে ঋণ দেয় তাহাদের হাতে থাকে 'কোম্পানীর কাগজ'; যে কোন সময়ে বাজারে উচ্চমূল্যে এগুলি বিকায়। ইহা হইতে ষ্টক এক্সচেঞ্জের উৎপত্তি। এই জাতীয়-ঋণ বাবদ যে সুদ বৎসর বৎসর দিতে হয়, তাহা জোগাইতে গিয়া সাধারণ লোকের নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর সরকার কর ধার্য করে। তাছাড়া অপর একটি বিষয় রহিয়াছে—শুল্কনীতিতে সংরক্ষণপন্থা। বিদেশী দ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করিয়া এমন ব্যবস্থা করা হয়, যেন এগুলি স্বদেশের বাজারে প্রবেশ না করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় দেশীয় পুঁজিপতিদের দ্রব্যাদি সাধারণ লোকের নিকট বেশীদামে বিক্রয় করিবার সুবিধা জন্মে।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, জাতীয়-ঋণ, উচ্চহারে কর, সংরক্ষণ শুল্ক, বাণিজ্য-বিষয়ে যুদ্ধ—এগুলি যন্ত্রশিল্প শুরু হওয়ার পূর্বের বিশেষত্ব হইলেও, পরেও ইহারা তীব্র রূপ লয়।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে, প্রাথমিক-সঞ্চয় কোথায় গিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তিগত বিত্তের চেহারা বদলাইয়াছে। ক্ষুদ্র-উৎপাদনে যে-ই শ্রম-কারী, যন্ত্রপাতির অধিকার তাহারই। ক্ষুদ্র-উৎপাদনে জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বহুলোকের অধিকারে থাকে; উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণও ছড়াইয়া থাকে। ইহাদের কেন্দ্রীভূত করিয়া সমবায়-প্রথায় উৎপাদন-পরিচালনা, তখন সম্ভব ছিল না; কিন্তু এমন কতকগুলি সামাজিক ঘটনার সৃষ্টি হইল যে ক্ষুদ্র-উৎপাদনের বিলোপ অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইল। সমাজে তখন নূতন নূতন শক্তি নূতন নূতন প্রেরণা সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ইহাদের শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে, ইহাদের বিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। এই পুরাতন সমাজকে বিলুপ্ত করিয়া ব্যক্তিগত উৎপাদনের জায়গায় সমষ্টিগত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন জমি হইতে কৃষকের উচ্ছেদ; যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ হইতে প্রকৃত শ্রমকারীর অধিকার হরণ, কতিপয়ের হাতে জমি ও যন্ত্রপাতির কেন্দ্রীভূক্তি।

এগুলি হইল পুঁজির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সূচনা। এই পরিবর্তনের ধারা যখন পুরাতন সমাজকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিল, শ্রমকারী জমিজমা ও যন্ত্রপাতিহীন দিন-মজুরে পরিণত হইল, তখন উৎপাদন নূতন একটি রূপ পরিগ্রহ করিল। ব্যক্তিগত-বিত্ত সুপ্রতিষ্ঠিতই রহিল বটে, কিন্তু বহু লোক ব্যক্তিগত-বিত্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িল। পুঁজিবাদের মারণ-অস্ত্র রহিয়াছে পুঁজিবাদেরই বিকাশের ভিতরে। একজন পুঁজিপতি বড় হইতে পারে প্রতিযোগিতার যুদ্ধে অপর একজন পুঁজিপতিকে ধ্বংস করিয়া। এইভাবে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি মুষ্টিমেয় কতিপয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। শ্রম-প্রক্রিয়া সমবায়-রীতিতে

পরিচালিত হয়; উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী প্রবর্তিত হয়। প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজিপতি মালিকের সংখ্যা কমিয়া যতই বড় বড় জনকয়েক পুঁজিপতি দেখা দিবে, ততই দারিদ্র, পীড়ন, দাসত্ব ও শোষণ বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের দল বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়; বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় তাহারা যত বেশী-সংখ্যায় সমবেত ও একত্রিত হয়, ততই তাহারা সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে থাকে। শ্রমের এই সমষ্টিগত এবং উৎপাদনের সমাজগতরূপ এত প্রচণ্ডভাবে বিকশিত হইতে থাকে যে উৎপাদনের বিকাশের পথে পুঁজিতন্ত্র স্বয়ংই হইয়া দাঁড়ায় মস্ত প্রতিবন্ধক। যে কাঠামোর ভিতরে নূতন উৎপাদনশক্তি উদ্গত হইয়াছে তাহার প্রচণ্ড বেগ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পুঁজিতন্ত্র স্বয়ংই ধ্বসিয়া পড়ে। এতকাল যাহারা শোষণকারী ছিল, তাহাদেরই আজ নিঃ-স্বত্ব হইতে হইবে।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র-উৎপাদন ধ্বংস করিয়া পুঁজিবাদী-উৎপাদন গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ উৎপাদনে বহু লোকের শ্রম সমবেতভাবে নিয়োজিত হইলেও উৎপাদনের ফল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু এই উৎপাদনের ভিতরেই তাহার ধ্বংসের বীজ সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধ্বংস দ্বারা শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হইবে না; সমাজ-সম্পত্তির উপর তাহাদের সমবায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ ঘটিবে। পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের সময় মুষ্টিমেয় লোক বহু লোকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে; পুঁজিতন্ত্রের অবসানের সময় আমরা দেখিতেছি বহুসংখ্যক লোক অল্পসংখ্যক লোকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবে।

একরকমের ব্যক্তিগত-বিত্ত নির্ভর করে উৎপাদনকারীর আপন শ্রমের উপর; অন্যরকমের ব্যক্তিগত-বিত্ত নির্ভর করে অপরকে খাটানোর উপর। পলিটিকেল ইকনমি দু'য়ের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া গোল

করিয়া ফেলে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে পরেরটি প্রথমটির অস্তিত্ব লোপ করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। পরেরটিকে আমরা বলি পুঁজিতন্ত্র ; এই পুঁজিতন্ত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিতও হইয়াছে, তখন আর তাহার উদ্ভবের কারণাদি না দেখিয়া পলিটিকেল ইকনমি জোর গলায় বলিতে ছাড়ে না যে পুঁজি এবং পুঁজিসংক্রান্ত সূত্রাদি চিরকালই আছে ; ইহারা কোন একটি যুগ-বিশেষের সৃষ্টি নয়। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে তাহা নয় ; সেখানে আপন যন্ত্রপাতি এবং উপকরণাদির মালিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা পুঁজিপতির চেষ্টা ও স্বার্থের সহিত সংঘর্ষে আসে। যেখানে পুঁজিপতিদের পশ্চাতে তাহাদের নিজেদের রাষ্ট্রশক্তি পুঁজিপতিদের সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, সেখানে জোর করিয়াই উপনিবেশগুলির পুরাতন উৎপাদন-প্রথার উৎখাত করিয়া রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। পলিটিকেল ইকনমিষ্টরা সাধারণতঃ পুঁজিপতিদের তোষামোদে ও ভাড়াটে। ইংলণ্ডের মত পুরাতন দেশে পুঁজিপতির স্বার্থকে সমর্থন করিতে হইলে বলিতেই হয় যে পুঁজি একটি সনাতন বস্তু ; আবার উপনিবেশগুলির মতন নূতন দেশে পুঁজিপতিরই স্বার্থ-রক্ষার জন্য ইকনমিষ্টদের স্বীকার করিতে হয়, পুরাতন উৎপাদন-প্রথাকে উৎখাত করিয়া তবে পুঁজির প্রতিষ্ঠা হইবে। এই বিরোধকে স্বীকার না করিয়া ত উপায় নাই ; কেন না, মজুর সৃষ্টি না করিলে যে বিদেশী পুঁজিপতির সোয়াস্তি নাই। ওয়েকফিল্ডের ঔপনিবেশিক-তত্ত্ব এইখানে উল্লেখযোগ্য ; স্বদেশী গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে পুরাতন উৎপাদন-প্রথাকে উচ্ছেদ করিয়া মজুরদের সৃষ্টি করাকে তিনি আখ্যা দিয়াছেন 'systematic colonisation'।

ওয়েকফিল্ড আবিষ্কার করিলেন, উপনিবেশগুলিতে অর্থ, যন্ত্রপাতি অথবা অন্যান্য অনেক-কিছুর মালিক হইলেও তাহাকে পুঁজিপতি বলা চলে না, যতক্ষণ না তাহার অধীনে উপযুক্ত পরিমাণ মজুর থাকে।

তিনি একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, মিঃ পিল ইংলণ্ড হইতে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের মুদ্রা এবং অন্যান্য উপকরণ সহ ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়ায় যান; সাথে তিন-হাজার মজুর লইতেও ভুলিলেন না। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই এমন একটি লোক আর তাহার সহিত রহিল না যাহাকে দিয়া মিঃ পিল তাহার প্রতিদিনের কাজকর্ম করাইয়া লইতে পারেন।

উৎপাদনের উপকরণাদি যতক্ষণ প্রকৃত উৎপাদনকারীর অধিকারে আছে, ততক্ষণ ইহারা পুঁজি নয়। ইহারা পুঁজি হইতে পারে তখনই যখন ইহাদের শোষণের কাজে লাগানো সম্ভব হয়, ইহাদের দ্বারা মজুরকে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কৃষকগণকে জমি হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিলেই পুঁজিতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু উপনিবেশগুলিতে প্রায় সকল জমির রাষ্ট্রের জমি। সেখানে যে-কোনও ঔপনিবেশিক অল্প মূল্যে আপন ব্যবহারের জন্য জমি রাষ্ট্র হইতে ক্রয় করিয়া লইতে পারে। স্বদেশ হইতে উপনিবেশে মজুর লইয়া গেলেও অল্পদিন পুঁজিপতির নিকট কাজ করিয়াই তাহারা জমি ক্রয় করিয়া মালিক হইয়া বসে। ওয়েকফিল্ড তাই বিধান দিলেন, ইংলণ্ডের মতন পুরাতন দেশগুলিতে মজুরেরা প্রকৃতির নিয়মে পুঁজিপতির দাস হইয়া থাকে, উপনিবেশগুলির মতন নূতন দেশে এই অবস্থাটি মানুষের ব্যবস্থা দ্বারা সৃষ্টি করিবে।

ইউরোপ হইতে আগত পুঁজিপতির অধিনস্থ শ্রমিকেরা কিছুদিন কাজ করিয়া সামান্য অর্থসঞ্চয় করিলেই সস্তায় জমি কিনিয়া নিজেই মালিক হইয়া বসে; ইহা পুঁজিতন্ত্র-বিরোধী। এই কেন্সারকে দুর না করিতে পারিলে উপনিবেশে পুঁজিতন্ত্রের ভবিষ্যত একবারেই অন্ধকার। নিম্নোক্ত ব্যবস্থায় সকল অসুবিধা দূরীভূত হইল। সরকারী জমি কিনিতে

হইলে তখন আর সস্তায় ক্রয় করা সম্ভব হইল না; সরকার হইতে জমির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। যে কেহ কিনিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকে বহুদিন পুঁজিপতির অধীনের কাজ করিরা তবে জমি ক্রয় করিবার মত উপযুক্ত অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে। জমির মূল্য বাজারে চাহিদা ও জোগানের নিয়মে নির্ধারিত হইবে না; মূল্য ঠিক হইবে পুঁজিপতির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। এই ব্যবস্থা হইতে আরও একটি সুবিধা হইবে। নির্ধারিত জমির উচ্চমূল্য হইতে যে অর্থ সরকারের হাতে জমিবে তাহা ইউরোপ হইতে পুনরায় মজুর আমদানী করার জন্য ব্যয়িত হইবে। এই ব্যবস্থা হইতে আমরা উপসংহার করিতে পারি, যে মজুর জমির মালিক হইতে চলিয়াছে তাহাকে মালিক হইবার পূর্বে পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি সরকারের তহবিল পুনরায় শ্রমিক আমদানী করার মত অর্থ জমা দিতে হইবে; এই ব্যবস্থা না করিয়া কেহ জমির মালিক হইতে পারিবে না।

ঃ সমাপ্ত ঃ